সিকিমের আদিবাসী লেপচা

(লেপচা উপজাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস)

অরুণ মৈত্র

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

প্রকাশক :

নিভা মুখোপাধ্যায়

ম্যানেজিং ডিরেক্টার

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬১

প্রচ্ছটপট : তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

মুদ্রাকর :

শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত

নবশক্তি প্রেস

১২৩ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড

কলিকাতা-৭০০০১৪

"সিকিমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়
যে সকল লেপচা দেশপ্রেমিক
সংগ্রাম করেছেন
তাঁদের প্রতি……"

—অরুণ মৈত্র

ঃ শুভেচ্ছা ঃ

আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও একজন আদিবাসী হিসাবে গর্বিত যে উত্তর-বাংলার সুপরিচিত জাতিতত্ত্বগবেষক ও কবি শ্রীঅরুণ মৈত্র তাঁহার দীর্ঘকালের গবেষণার ফলশ্রুতি "সিকিমের আদিবাসী লেপচা" নামক একটি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন। লেখক সুদীর্ঘকাল দার্জিলিং জিলায় বসবাস করিয়াছেন ও লেপচা উপজাতির সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। তিনি সিকিম, ভুটান ও নেপালের বহু লেপচা-অধ্যুষিত অঞ্চলে পর্যটন করিয়া অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন যাহা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

"লেপচা" পশ্চিমবাংলার একটি তপশিলী উপজাতি। লেপচা সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, পালাপার্বণ সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য এই পুস্তকে রহিয়াছে। তথ্যগুলি যুক্তিনির্ভর. বৈজ্ঞানিক ও প্রণিধানযোগ্য।

আমি সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এই পুস্তকটি সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আশা করি অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষকদের দ্বারা এই পুস্তকটি সাদরে গৃহীত হইবে।

লেখক শ্রীমৈত্রকে আমি এই অসামান্য অবদানের জন্য অভিনন্দন জানাই।

ডেনিস লাকড়া

Dr. Charu Chandra Sanyal, Jalpaiguri
M.Sc., D. Litt.,

কয়েকটি কথা

শ্রীঅরুণ মৈত্রের বাল্য ও কৈশোর কাটিয়াছে দার্জিলিঙ্ হিমালয়ের বুকে। যৌবনে সরকারী চাকুরী করিয়াছেন হিমালয়েরই গভীরে। দার্জিলিঙ্ ও সিকিমের অতি প্রাচীন আদিবাসী লেপচাদের সাথে মিশিয়াছেন নিবিড়ভাবে। গ্রাম্য লেপচাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সাথে পরিচিত হইয়াছেন। তাহাদের গ্রাম, বসতি, বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ে জলপাইগুড়ির সাপ্তাহিক "জনমত" পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে। এইগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার সংবাদ নিই ও উৎসাহ দান করি। এখন লেখাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। আশা করি পুস্তকখানি বিদগ্ধ জনসমাজকে আকৃষ্ট করিবে। বর্তমান যুগের সরকারী কর্মচারীর পক্ষে এই প্রচেষ্টা শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই।

প্রায় আশী হইতে একশত বৎসর পূর্বে ড্যালটন, মরিস, রিজলে, বিউভেয়ার, এডকার, ওয়াডেল প্রভৃতি মনীষিগণ লেপচাদের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। গ্রীয়ারসন, মেইনওয়ারীং প্রভৃতি তাদের ভাষা আলোচনা করিয়াছেন। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে জনগণনার মাধ্যমে শ্রীঅশোক মিত্র, আই. সি. এস. কিছু নূতন তথ্য দিয়াছেন। মাত্র দশ বৎসর পূর্বে পশ্চিম বাংলা উপজাতি কল্যাণ বিভাগ হইতে শ্রীঅমল দাস ও শ্রীস্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় লেপচাদের বহু তথ্যপূর্ণ জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীঅরুণ মৈত্রের বিবরণে আরও কিছু নূতন তথ্য আছে। তাহাদের ঘরের কথা।

জাতীয় সংহতির প্রচেষ্টা হইতেছে। পাশের বাড়ির মানুষের সহিত পরিচিত না হইলে ইহা সম্ভব হয় না। অতীতে মানবগোষ্ঠীর কিছু অংশ বনে, জংগলে, পাহাড়ের নিভৃত কোণে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। তাহাদের উপজাতি, অনগ্রসর আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা মনে করিতে শিখিয়াছে "দীনের হতে দীন···সবহারাদের মাঝে।" এই মনোভাবের পরিবর্তন করিতে হইবে। বর্তমানে কিছু অর্থ সাহায্য দিয়া ও আধুনিক শিক্ষার বিশেষ সুবিধা দিয়া তাহাদের উন্নত করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু

তাহাদের অতীত ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া জানাইতে হইবে। তাহা ছাড়া ভেড়ার বাচ্চা নয়, এককালে সিংহের বাচ্চা ছিলো, সম্ভব হইলে এ সংবাদ তাহাদের দিতে হইবে।

তাহাদের যা' কিছু সুন্দর, যা' কিছু উৎকৃষ্ট তাহাই তুলিয়া ধরিতে হইবে। বর্তমানে সমাজ-বিজ্ঞানীদের সম্মুখে এই এক বিরাট কর্তব্য আসিয়াছে।

শ্রীঅরুণ মৈত্র প্রমুখ দরদী গবেষকদের সংগ্রহমালা হইবে এই দুরূহ কার্যের পাথেয়।

শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল

আমার কথা ঃ

সুদীর্ঘ পনেরো বছরের পরিশ্রমে রচিত হয়েছে "সিকিমের আদিবাসী লেপচা"। মুখ্যত পুস্তকটিতে লেপচাদের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহে, পথ-পরিক্রমায় ও অনুসন্ধানে যাঁরা আন্তরিকভাবে আমাকে সহায়তা দান করেছেন তাঁরা হলেন দার্জিলিঙের সর্বশ্রী টেণ্ডু ছিড়িং লেপচা, সোনাম ছিড়িং লেপচা, জোশেফ কার্থাক, গিরি সোরাব জোঙ্, রামপ্রসাদ লামা, জ্ঞানেশ্বর গিরি ; কালিম্পঙের সর্বশ্রী জোশেফ রোঙ্গঙ্, আর্থার ফনিঙ্, বারসিং লেপচা, লেহ্থপ লেপচা ; কার্সিয়ঙের সর্বশ্রী গ্যাল্জেন ছিড়িং লেপচা, এস. পি. লেপচা, মংগলসিং থাপা, ইন্দ্রপ্রসাদ শর্মা ; গ্যাংটকের (সিকিম) শ্রী জি. ছিড়িং লেপচা এবং নেপাল ও ভুটান রাজ্যের বহু শুভানুধ্যায়ী বন্ধু। এঁদের প্রত্যেককে আমার সশ্রদ্ধ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আর বহু মূল্যবান পুঁথিপত্র, নথিপত্রের হদিস দিয়ে যাঁরা আমাকে এই দুরূহ কার্যে পাথেয় জুগিয়েছেন তাঁরা হলেন জ্ঞানসাধক ডক্টর ভবেশচন্দ্র চৌধুরী, এফ. আর. এ. এস. পি এইচ. ডি. এবং "The Santhals" প্রণেতা জ্ঞানতপস্বী শ্রীযুক্ত চারুলাল মুখোপাধ্যায়, এম, এ. , বি, এল. , বি, টি.। সদাসর্বদা যিনি আমার গবেষণাকার্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করে ও মূল্যবান উপদেশ দানে কৃতার্থ করেছেন তিনি হলেন "The Rajbanshis of North Bengal" প্রণেতা, রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত অন্যতম লোকসংস্কৃতি গবেষক ডক্টর চারুচন্দ্র সান্যাল, এম. এস-সি., ডি, লিট্.। এঁদের সাহায্য ব্যতিরেকে পুস্তকটির বিবরণসমূহ আদৌ বিজ্ঞানসম্মত হতো না।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালীন ভারতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রচলিত ভাষার প্রামাণ্য সূত্রাদি দিয়ে পত্রযোগে সহায়তা দান করে কৃতার্থ করেছেন জাতীয় অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনস্বী আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ., ডি, লিট.।

এঁদের কাছে আমার ঋণের সীমা-পরিসীমা নেই। সুতরাং পরিশোধের স্পর্ধা রাখি না।

সবশেষে যাঁর কথা না উল্লেখ করলে আমার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তিনি মেসার্স এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং (প্রাঃ) লিমিটেডের শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ রায়। তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি ছাড়া পুস্তকটি প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। তাঁকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। বইটির প্রকাশনায় সর্বাঙ্গীণ সহানুভূতি ও সহযোগিতা করেছেন শ্রীপ্রদীপমোহন চক্রবর্তী ও শ্রীতপনকুমার মৈত্র। এদের সহযোগিতা ছাড়া বইটি প্রকাশনা ত্বরান্বিত হতো না।

বিনীত
অরুণ মৈত্র

সূচীপত্র ঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়





[illegible]



একটি লেপচা পরিবারের লোকেরা



লেপচা বৃদ্ধ



দুটি লেপচা কিশোরী



প্রাকৃতিক পরিবেশে দুটি লেপচা শিশু
সেলফু গ্রাম



দুইজন লেপচা পুরুষ



লেপচা কৃষক রমণী



এস. পি. লেপচা ও তার পরিবার



লেপচা পুরোহিত • বঙথিং



লেপচা মহিলা পুরোহিত • মুন



লেপচা [illegible]নিক মহিলা



লেপচা পোষাক পরিহিতা
প্রাচীনা মহিলা

প্রথম অধ্যায়

১। পূর্বকথা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দার্জিলিঙ জেলা সিকিমের রাজার শাসনাধীন এলাকার অন্তর্গত ছিলো।

১৭০৬ সালে দার্জিলিঙ্ জেলার বর্তমান কালিম্পঙ্ মহকুমাধীন এলাকাটি ভুটানীরা সিকিমের কর্তৃত্ব মুক্ত করে। পরবর্তীকালে সিকিমের রাজা নেপালের সংগে এক দুঃখজনক বিবাদে লিপ্ত হয় এবং ১৭৮০ সালে সিকিম আক্রান্ত হয়। এরপর প্রায় একটানা ত্রিশ বছর সংঘর্ষে ও যুদ্ধের ফলে সিকিম রাজাকে সম্পূর্ণ পরাভূত করে সুদূর পূর্বপ্রান্তে তিস্তার উপকূলভাগ পর্যন্ত নিজেদের অধিকার বিস্তার করে নেপালরাজ্যের সীমা তরাই অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যায়। ১৮১৭ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাথে নেপালীদের এক যুদ্ধ সুরু হয় এবং "তেঁতুলিয়ার সন্ধি" দ্বারা যার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সন্ধির ফলে সিকিমের রাজাকে পর্যুদস্ত করে যে অংশটি নেপালীরা অধিকার করে তা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সন্ধির ফলে মেচী নদী ও তিস্তা নদীর মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে সিকিম রাজাকে প্রত্যর্পণ করে এবং সিকিম রাজ্যকে স্বীকৃতি দান করে। সিকিম রাজ্য সেই সময় থেকেই নেপাল ও ভুটান রাজ্যের মধ্যবর্তী একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত হয়।

"তেঁতুলিয়া সন্ধি" দ্বারা সিকিম রাজা নিজ রাজ্যের সংগে প্রতিবেশী রাজ্যের বিবাদ বা সংঘর্ষে মধ্যস্থতা করবার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে স্বীকার করে নেয়। দশ বছর পরে রাজ্যের সীমানা প্রশ্ন নিয়ে পুনরায় সিকিম ও নেপালের মধ্যে সংঘর্ষে ভারতবর্ষের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

১৮২৮ সালে ক্যাপ্টেন লয়েড্ ও গ্রান্ট এই বিবাদের মীমাংসা করার জন্য সিকিমের কুলহাইত উপত্যকায় রিন্-চিন্-পোঙ্ (Rin-chin-pong) নামক স্থানে উপস্থিত হন। ১৮২৮-২৯ সালের মধ্যে কোনো এক সময়ে ক্যাপ্টেন লয়েড্ তৎকালীন সিকিমের এলাকাধীন দার্জিলিঙ্ অঞ্চলে অবস্থান করেন। সেই সময় দার্জিলিঙ্ শহরে জনবসতি ছিলো না বললেই চলে। দার্জিলিঙ্ নামে একটি পার্বত্য গ্রামে বাস করতেন একজন প্রধান কাজী (ভূস্বামী বিশেষ) ও তার কর্মচারীসহ সামান্য কয়েকটি পরিবার।

ক্যাপ্টেন লয়েড্ দার্জিলিঙ্ অঞ্চলে একটি স্বাস্থ্যনিবাস (Sanitarium) ও সৈন্যাবাস (Cantonment) নির্মাণের পরিকল্পনা করেন এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে তাঁর এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক এই ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধান ও যৌক্তিকতা বিচারের জন্য ভারতবর্ষের তৎকালীন ডেপুটি সার্ভেয়ার জেনারেল ক্যাপ্টেন হারবার্টকে প্রেরণ করেন। পরবর্তীকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণও এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।

জেনারেল লয়েড্কে (পূর্বতন ক্যাপ্টেন লয়েড্) সিকিমরাজের সঙ্গে এই স্বাস্থ্যনিবাস ও সৈন্যাবাস নির্মাণের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য লর্ড বেন্টিঙ্ক ক্ষমতা প্রদান করেন। এই সময় হঠাৎ সিকিম রাজ্য থেকে বেশ কিছু সংখ্যক লেপচা নেপালে প্রবেশ করে এবং এর কার্যকারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত জেনারেল লয়েড্কে সিকিমের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়। জেনারেল লয়েড্ সিকিমরাজকে এই সুযোগে দার্জিলিঙ্ অঞ্চলে স্বাস্থ্যনিবাস ও সৈন্যাবাস নির্মাণের প্রস্তাব পেশ করেন এবং অনুমতি প্রার্থনা করেন। সিকিমরাজ ১৮৩৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী এক সনদ বলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ঐ অঞ্চলটি ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এই অনুমতি প্রদান নিঃসর্ত

ছিলো। যেহেতু ঐ এলাকায় তখন জনবসতি খুবই নগণ্য ছিলো ও বসবাসের অযোগ্য ছিলো সেহেতুই নিঃসর্ত অনুমতি ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে সে সনদে উল্লেখ করা সম্ভব ছিলো না। পরে ১৮৪১ সালে ব্রিটিশ সরকার ঐ অঞ্চল ব্যবহারের নিমিত্ত একটি বিশেষ ভাতা স্বরূপ সিকিমরাজকে বাৎসরিক তিন হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ১৮৪৬ সালে তিন হাজারের স্থলে ছয় হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

১৮৩৫ সালে সিকিমরাজের অনুমতি দানের পরে ১৮৩৬ সালে জেনারেল লয়েড্ ও ডাক্তার চ্যাপমান (Dr. Chapman) দার্জিলিঙ্ অঞ্চলের আবহাওয়া, পরিবেশ ও স্থান ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধানের নিমিত্ত দার্জিলিঙে প্রবেশ করেন। তাঁরা ১৮৩৬ ও ১৮৩৭ সালের শীতকাল দার্জিলিঙে অতিবাহিত করেন। ১৮৩৭ সালে জেনারেল লয়েড্ দার্জিলিঙ্ অঞ্চলের জমির বিলিব্যবস্থা করার জন্য একজন "আইনজ্ঞ প্রতিনিধি"কে নিয়োগ করেন। দুই-এক বছরের মধ্যেই কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে ধনী ব্যক্তিরা জমি ক্রয় ইত্যাদি ব্যাপারে দার্জিলিঙে আসেন ও পরবর্তীকালে গৃহাদি নির্মাণ করেন। ১৮৩৬ সালে যে অঞ্চলে সিকিমরাজের অনুমতি অনুসারে নির্মিত গুটিকয়েক কুঁড়ে জাতীয় ঘরের সন্ধান পাওয়া গেছে, ১৮৪০ সালে সেখানে বেশ কয়েকটি বাড়ি তৈরি হয়েছে দেখা যায়। ১৮৪০ সালেই দার্জিলিঙ্ থেকে পাঙ্খাবাড়ি (বর্তমানে কার্সিয়ঙ্ মহকুমার অন্তর্গত) পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মিত হয়। এই রাস্তাটিই পুরাতন মিলিটারী রোড নামে পরিচিত। পাঙ্খাবাড়ি ও মহালদিরাম চা বাগান এলাকায় দুটি বাংলো বাড়ি নির্মিত হয়। ঐ ১৮৪০ সালেই কার্সিয়ঙ্ ও দার্জিলিঙে দুটি হোটেল খোলা হয়। দার্জিলিঙ্ অঞ্চলের লেবং (Lebong) এলাকাতেই ঐ সময় জনবসতি বিশেষ ঘন দেখা যায়। প্রায় ত্রিশখানা বাড়ি ঐ এলাকায় নির্মিত হয়। বাকী অংশ ঘন অরণ্যে আবৃত ছিলো এবং জনবসতির কোনো সম্ভাবনা

ছিলো না বললেই চলে। এই জনবিরলতার হেতু হিসাবে ক্যাপ্টেন হারবার্ট মনে করেন যে সিকিমের তৎকালীন জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের অধিকারী লেপচা উপজাতির অন্তর্গত প্রায় বারোশত সবলদেহী মানুষকে সিকিমরাজের উৎপীড়নে দার্জিলিঙ্ (তৎকালে সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত) অঞ্চল পরিত্যাগ করে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সিকিমরাজ তাঁর প্রজাদের দার্জিলিঙ্ অঞ্চলে যাওয়া নিষিদ্ধ করেন এবং লেপচারা যে কৃষিব্যবস্থা চালু করেছিলো তা নষ্ট করে দেন।

১৮৩৯ সালে "ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে"র ডাক্তার ক্যাম্প-বেলকে (Dr. Campbell) দার্জিলিঙ্ অঞ্চলের "অবেক্ষক" (Superintendent) বা ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব, বিচার ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নকল্পে নিয়োজিত আধিকারীক পদে নিয়োগ করা হয়। ইতিপূর্বে তিনি নেপালে ব্রিটিশরাজের প্রতিনিধি ছিলেন। ডাক্তার ক্যাম্পবেলকে সিকিমরাজের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ডাক্তার ক্যাম্পবেল বহিরাগতদের সাদরে গ্রহণ করতেন এবং কৃষিকাজ করবার জন্য সাহায্য দান করতেন। এবং এইভাবে যে ১৮৩৯ সালে দার্জিলিঙ্ জেলায় লোকসংখ্যা অনধিক একশত ছিলো, ১৮৪৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে কমবেশী দশ হাজারে পৌঁছুলো। বহিরাগতদের প্রতি ডাক্তার ক্যাম্পবেলের প্রীতির ফলে সিকিমের সংগে ব্রিটিশ সরকারের সৌহার্দ্য নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়।

দার্জিলিঙ্ অঞ্চলে জনবসতি ক্রমেই বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসা বাণিজ্য সুরু হয়।

সিকিমরাজ এবং সিকিমরাজের অধীনস্থ কয়েকজন প্রতাপশালী ভূস্বামী এর ফলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। বিশেষতঃ দার্জিলিঙ্ অঞ্চলে বসবাসকারী ব্রিটিশ প্রজাদের উপর সিকিমরাজের কোনো আইনই কার্যকরী ছিলো না এবং যথার্থই এ অঞ্চলের অধিবাসীরা স্বাধীন

নাগরিক হিসাবে জীবনযাপন করতো। সিকিমরাজ দরবারের আমলাদের প্ররোচনা ও তৎকালীন সিকিমরাজ্যের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও ভূস্বামীদের সহায়তায় দার্জিলিঙ্ অঞ্চল থেকে প্রায়ই মানুষ অপহরণ করা হতো অথবা সিকিমের প্রজাদের প্রত্যর্পণ করতে আদেশ দেওয়া হতো। এই অবস্থা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছয় ১৮৪৯ সালে। ব্রিটিশরাজ ও সিকিমরাজের বৈধ আদেশ বলে ডাক্তার ক্যাম্পবেল ও স্যার জোশেফ হুকার (Sir Joseph Hooker) যখন সিকিম রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন তখন হঠাৎ তাঁদের অপহরণ করা হয়। তাঁদের মুক্তিপণ হিসাবে সিকিমরাজের তরফ থেকে নানা রকম আবদার করা হয়। কিন্তু অবশেষে ১৮৪৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তাঁদের নিঃসর্ত মুক্তি দেওয়া হয়।

১৮৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটিশ সরকার একটি ছোটো সৈন্যদলকে সিকিমে প্রেরণ করেন। তারা অনতিকালের মধ্যেই সিকিমের তরাই অঞ্চল সম্পূর্ণ অধিকার করে যার আয়তন প্রায় ৬৪০ বর্গমাইল। ১৮৫০ সালে এই তরাই অঞ্চল অধিকারের পর দক্ষিণভাগ পূর্ণিয়া জেলার সংগে যোগ করা হয়।

কিন্তু পরবর্তীকালে স্থানীয় জনসাধারণের আপত্তির ফলে এই ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়। এবং অধিকৃত সম্পূর্ণ অঞ্চল দার্জিলিঙের সংগে যুক্ত করা হয়। এই তরাই অঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চলকে জেলা সুপারিনটেনডেন্টের (District Superintendent) কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়। ১৮৫০ সালের ৮ই মে এই জেলা সুপারিনটেনডেন্টকে "ডেপুটি কমিশনার" (Deputy Commissioner) নামে আখ্যা দেওয়া হয়।

সিকিমের তরাই অঞ্চল সমূহের সংগে দার্জিলিঙ্ অঞ্চলের যোগসাধনের ফলে সিকিমরাজ ও ব্রিটিশদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবহারিক পরিবর্তন দেখা গেলো। তবুও শুধুমাত্র প্রাণী অপহরণ ও প্রত্যর্পণের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিলো।

১৮৬০ সালের নভেম্বর মাসে ডাক্তার ক্যাম্পবেল মাত্র ১৬০ জন সৈন্যসহ তিস্তা নদী (রম্মন) পার হয়ে রিনচিনপোঙ্ (কালিম্পঙ্ ?) অভিমুখে রওনা হন। তাঁকে অবশ্য অবিলম্বে বাধার সম্মুখীন হতে হয় ও ফিরে আসতে হয়। পরবর্তীকালে অনতিবিলম্বে কর্নেল হাউলার এবং স্যার অ্যাসলে ইডেন (তৎকালীন আঞ্চলিক রাজপ্রতিনিধি ও বিশেষ অধিকর্তা) প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রসহ ২৬০০ জন সৈন্য নিয়ে সিকিমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। ১৮৬১ সালের মার্চ মাস নাগাদ তাঁরা সিকিমের তৎকালীন রাজধানী তুমলোঙ্ (Tumlong) অবরোধ করেন।

সিকিমরাজের অসুস্থতাহেতু সে সময় শাসনভার পরিচালনার দায়িত্ব ছিলো দেওয়ান নামগ্যালের উপর। তিনি অবস্থা বেগতিক দেখে পালিয়ে যান এবং সিকিমরাজ তাঁর পুত্রের কাছে রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করেন। ১৮৬১ সালের ২৮শে মার্চ সিকিমরাজের সংগে ব্রিটিশরাজের একটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। যার ফলে সিকিম সীমান্ত পার হয়ে ব্রিটিশ নাগরিকেরা অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার পায়।

কিন্তু এইভাবে সীমান্ত সমস্যার সম্পূর্ণভাবে অবসান হলো না। ১৮৬২ সালে হঠাৎ ভুটানীরা দার্জিলিঙ্ আক্রমণের জন্য হুমকি দেয়। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সৈন্যদল প্রেরণ করা হয়। ১৮৬৩ সালে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি হিসাবে স্যার অ্যাসলে ইডেনকে ভুটানে প্রেরণ করা হয়। স্যার অ্যাসলে ইডেন ভুটানরাজের সংগে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা সুরু করেন কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল হয়। উপরন্তু তিনি প্রাণভয়ে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন, যে চুক্তিপত্রের সর্তানুযায়ী আসাম সীমান্তের ভুটান রাজ্যের তরাই অঞ্চলসমূহকে অবিলম্বে ভুটানরাজকে প্রত্যর্পণ করতে হবে। তাঁর সংগে ভুটান-রাজ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেন বলে জানা যায়। ১৮৬৪

সালে বহু কষ্টে ও গোপনে রাত্রির অন্ধকারে তিনি পুনাখা (Punakha) পরিত্যাগ করে দার্জিলিঙে প্রবেশ করতে সক্ষম হন।

ভুটানরাজের সংগে সর্বপ্রকার সমঝোতার প্রস্তাব ও সম্ভাবনা বানচাল হয়ে গেলো।

অবশেষে ১৮৬৫ সালের নভেম্বর মাসে স্যার অ্যাসলে ইডেন পুনরায় ভুটানে প্রবেশ করেন এবং পূর্বের চুক্তিপত্র রদ করে নতুন চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। যার ফলে ভুটানের তরাই অঞ্চলের কিয়দংশসহ কালিম্পঙ্-এর বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলসমূহ ব্রিটিশ অধিকারে আসে। এই চুক্তির ফলে ভুটানরাজকে বাৎসরিক খাজনা দেওয়ার কথাও উল্লেখিত ছিলো। সেই সময়ে কালিম্পঙ্কে একটি মহকুমা হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং এই মহকুমাকে "পশ্চিম দুয়ার" (Western-Dooars) অংশের সংগে জুড়ে দেওয়া হয়। পরে ১৮৬৬ সালে কালিম্পঙ্ মহকুমাকে দার্জিলিঙ্ জেলার সংগে যোগ করা হয়। এই অংশটি দার্জিলিঙ্ জেলার তৎকালীন সর্বশেষ সংযোজন।

কালিম্পঙ্ সংযোজনের পরে দার্জিলিঙ্ জেলা দুটি মহকুমায় ও তরাই অঞ্চলে বিভক্ত হয়। তরাই অঞ্চলসমূহের মহকুমা কার্যালয় বর্তমান শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া থানার অধীন "হাঁসখাওয়া" নামক স্থানে অবস্থিত ছিলো। ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত তরাই অঞ্চলের মহকুমা কার্যালয় এইখানে ছিলো। পরে এই তরাই অঞ্চলসমূহের অধিকাংশ শিলিগুড়ি মহকুমার সংগে সংযোজিত হয়।

ইতিমধ্যে দার্জিলিঙ্ জেলার অপর একটি মহকুমা কার্যালয় কার্সিয়ঙ্ নামক স্থানে স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৮৯১ সালে কার্সিয়ঙ্ মহকুমা স্বীকৃত হয়। ১৯১৬ সালে কালিম্পঙ্ মহকুমার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় এবং মহকুমা কার্যালয় কালিম্পঙে স্থাপিত হয়।

দার্জিলিঙ্ জেলা ১৯১২ সালে অবিভক্ত বাংলার রাজসাহী

বিভাগের (Rajshahi Division) অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভাগের পরেও এই জেলার সীমানা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং পশ্চিমবংগ রাজ্যের অন্যতম শরিক হিসাবে প্রেসিডেন্সী বিভাগের (Presidency Division) অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে অবশ্য প্রেসিডেন্সী বিভাগের নাম পরিবর্তন করে জলপাইগুড়ি বিভাগ (Jalpaiguri Division) রাখা হয়েছে।

২। সিকিমে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

লেপচা লোকগাথায় জানা যায় লেপচাদের আদি ধর্মগুরু ছিলেন থে-কুং-তেক্ (They-Kung-Tek) ও গুরুপত্নী ছিলেন নিকুঙ-ঙ্যাল্ (Nikung-Yangal)। সে সময় ধর্মগুরুই রাজা ছিলেন। সেই অর্থে লেপচাদের রাজা ছিলেন থে-কুং-তেক্ এবং রাণী ছিলেন নিকুঙ-ঙ্যাল্।

রাজাকে লেপচা ভাষায় "পনূ" (Ponoo) এবং রাণীকে "পন্দী" (Pondee) বলা হয়। থে-কুং-তেক্ একাধারে রাজা ও "বুং-থিং" (লেপচা পুরোহিত) ছিলেন।

এক সময়ে তিব্বত থেকে কে-ব্যুমসা মতান্তরে খা-ব্যুমসা নামে এক ব্যক্তি একদল অভিযাত্রীসহ সিকিমে প্রবেশ করেন। কে-ব্যুমসা ছিলেন তিব্বতের খাম প্রদেশের অধিবাসী। এই অভিযাত্রী দল কালক্রমে সিকিমে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করে। পরবর্তীকালে আরও বহু তিব্বতী সিকিমে নানা কারণে প্রবেশ করে ও স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। এরা কেউ এসেছিলো ধর্মপ্রচার-কার্যে, কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য। এই সব তিব্বতীদের সন্তানসন্ততিরা পরবর্তীকালে "সিকিমী-ভুটিয়া" নামে পরিচিত হয়।

কে-ব্যুমসা থে-কুং-তেকের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য তার বাসস্থানে উপস্থিত হলে তাকে বাঁশের তৈরি চাটাই-এর উপর বসতে দেওয়া হয়। যে ঘরে এই আসন পাতা ছিলো, সে ঘরটি জংলী

এবং গৃহপালিত নানা জীবজন্তুর দাঁত, বুনো ফলের মালা এবং পাখীর পালক দিয়ে সজ্জিত ছিলো।

প্রাথমিক পরিচয়াদির পর কে-ব্যমসা থে-কুং-তেকের কাছে সন্তানলাভের জন্য বর প্রার্থনা করেন। থে-কুং-তেকের দ্বারা বর-প্রাপ্ত হয়ে কে-ব্যমসা নিজের বাসস্থান ছুম্বীতে (Chumbee) ফিরে গেলেন। কয়েক বছরের মধ্যে কে-ব্যমসার তিনটি পুত্র জন্মালো। তাদের নাম রাখা হলো যথাক্রমে—ক্যাবোরাপ্ (Kyaborap), ল্যাং মোরাপ্ (Lyang-Morap) এবং মিপোন্ (Mipon)।

তিনটি পুত্রের জন্মের পর কে-ব্যমসা, থে-কুং-তেকের কাছে ধন্যবাদ জানানোর জন্য গেলেন। তখন থে-কুং-তেক জানালেন যে কে-ব্যমসার সন্তানসন্ততির মধ্য থেকেই একদিন সিকিমের যোগ্য শাসকের আবির্ভাব হবে। কে-ব্যমসা ছিলেন তিব্বতীয় এবং থে-কুং-তেক ছিলেন সিকিমের অধিবাসী। সে কারণে ভবিষ্যতে সিকিমের শাসনকর্তা "তিব্বতীয়জাত" বলে সিকিমের অধিবাসীদের মনে শ্রদ্ধার অভাব যদি ঘটে, সেই কথা চিন্তা করে থে-কুং-তেক কে-ব্যমসার সাথে রক্তের সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন।

থে-কুং-তেক এক অভিনব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দুই উপজাতির মধ্যে এক অতি মধুর সম্পর্কের সূত্রপাত করেন। এই মিত্রতা স্থায়ী করবার জন্য তাঁরা নানা ধরনের জীবজন্তু বলিদান করলেন, পূজা-পাঠের ব্যবস্থা করলেন এবং সর্বোপরি বলিপ্রদত্ত পশুর রক্তের মধ্যে থে-কুং-তেক ও কে-ব্যমসা একত্র দাঁড়িয়ে চিরস্থায়ী সম্পর্কের জন্য পবিত্র শপথ গ্রহণ করলেন। জানা যায় এই অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি নিকুঙ্-ঙ্যালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকের নিকটবর্তী কাবে-লংচক (Kabey-Langchak) স্থানে সম্পন্ন হয়।

লী-সুন্-চেন্-পো মতান্তরে হ্লাৎ-সুন্-ছেন-পো (Lha-b-Tsun-Chhen-po) তিব্বতের য়্যোকসোম্ (Yokshome) অঞ্চল থেকে

বৌদ্ধধর্ম প্রচারকল্পে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দশকে সিকিমে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও ত্ব'জন বিশিষ্ট ধর্ম-প্রচারক। তাঁরা হলেন কাথোক্ কুনজাং পো (Kathok Kunjang Po) এবং ইংডাক্ সেমপা ফুনছোগ্ রিগজেন (Engdak Shempa Phunt-shog Rigjen)।

লা-স্থন্-চেন্-পো সিকিমের তৎকালীন জনমানসচিন্তা অনুধাবন করে বুঝলেন যে যদি বৌদ্ধধর্মকে স্থায়ীভাবে সিকিমে প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে তৎকালীন সিকিমের স্বনির্বাচিত শাসক ফুঞ্চো নামগ্যালকে সিকিমের অধিপতি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তারই সহায়তায় বৌদ্ধধর্মকে সিকিমে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মতান্তরে জানা যায় যে এই বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকেরা নানা গবেষণা ও চর্চার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যে সব ব্যক্তির নামের আদ্যক্ষর "ফ" সেই সব ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই সিকিমের প্রকৃত শাসনকর্তা নির্বাচিত হওয়া উচিত।

সমগ্র সিকিম রাজ্যে খোঁজাখুঁজি সুরু হলো। অনুসন্ধানকারীর একটি দল একদিন সন্ধ্যাবেলায় একটি লোককে গাভীদোহন করতে দেখে। তারা তাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করে। দোহনকারী লোকটি বলে তার নাম ফুঞ্চো নামগ্যাল। অনুসন্ধানকারীরা তাঁকে বৌদ্ধধর্মগুরুদের নির্দেশ জানায়।

ফুঞ্চো নামগ্যাল অতঃপর লা-স্থন্-চেন-পো এবং অন্য ত্বই ধর্ম-প্রচারকের সংগে সাক্ষাৎ করে ও অনুসন্ধানকারীদের বিবরণ পেশ করেন।

অতঃপর তিনি ধর্মগুরুদের নির্দেশে ইংরাজী ১৬৪১-৪২ সালের কোনো এক সময়ে সিকিমের অধিপতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। অনুসন্ধানে জানা যায় যে এই ফুঞ্চো নামগ্যাল, কে-ব্যুমসার (মতান্তরে খা-ব্যুমসা) তৃতীয় পুত্র মিপোন-এর চতুর্থ পুত্র ধর্মগুরু তাশী-র (Tashey) প্রপৌত্রের একমাত্র পুত্র ছিলেন।

সিকিমের অধিপতি হিসাবে স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে "চোগয়্যাল্" (Chogyal) বা "ধর্মরাজ" আখ্যা দেওয়া হয়। ফুন্ৎসো নামগ্যালই (Phuntsog Namgyal) সিকিমের প্রথম সর্বজন-স্বীকৃত নৃপতি। এর পর একে একে তেনসুঙ্ নামগ্যাল (Tensung Namgyal), ছাগদোর নামগ্যাল (Chhagdor Namgyal), গুরমেদ নামগ্যাল (Gyurmed Namgyal), পাঞ্চো নামগ্যাল (Pancho Namgyal), তেনজিং নামগ্যাল (Tenzing Namgyal), ছুগফুদ নামগ্যাল (Tsugfud Namgyal) প্রভৃতি নৃপতিরা।

৩। লেপচাদের উৎপত্তি ও আদিবাসস্থান

জাতিগত ও উপজাতিগত কৌলিন্যের দাবী আজ অনেক জাতি ও উপজাতির মধ্যেই সোচ্চার হয়ে উঠেছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের অধিকাংশের দাবীই নাকচ হয়ে যাচ্ছে ও যাবে কিন্তু তথ্যানুসন্ধানে ও পর্যালোচনায় লেপচা উপজাতি যথার্থই বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশের অধিকারী হয়েও লেপচা উপজাতি গবেষকদের হাতে বেশ কিছু মৌলিক সম্পদ তুলে দিতে পারে।

লেপচা প্রতিটি পালপার্বণ আর প্রতিটি উৎসব আয়োজনের পশ্চাতে হাজার হাজার বছর আগেকার পুরোনো কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে। এরা যে পালপার্বণ ও উৎসব আয়োজন বছরের পর বছর ধরে পালন করে আসছে তার পেছনে রয়েছে এদের একান্ত আপন বৈশিষ্ট্যের প্রবাহ। এরা এই বিংশশতাব্দীর শেষ-ধাপে তথাকথিত সভ্য সমাজের মানুষের সংগী হয়েও আপন কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সযত্নে পালনের মধ্য দিয়ে তাদের সাথে একই ধাপে পা ফেলার যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে তাতে মুগ্ধ হতে হয়। আর তাই পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট প্রান্তে কোণ-ঠাসা হয়ে থেকেও এরা আজও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

লেপচা উপজাতি পশ্চিমবাংলার তপশিলী আদিবাসী সম্প্রদায়-ভুক্ত। লেপচাদের আদি বাসভূমি সিকিম। প্রাচীনকালে সিকিমে নানা অনুসন্ধান করেও এর সঠিক প্রামাণ্য সীমা নির্ধারণ করা যায়নি। তবে এইটুকু জানা যায় এবং প্রমাণ পাওয়া গেছে যে বর্তমান দার্জিলিঙ্ জেলা এবং জলপাইগুড়ি জেলার তরাই অঞ্চল সমূহের অধিকাংশই সিকিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার অর্থ ও সন্ধিদ্বারা তার কিছু অংশ অধিকার করেন।

লেপচাদের আদি বাসস্থান সিকিমের তিনটি লেপচা নামের সন্ধান পাওয়া যায়। নাম তিনটি হলো (১) "ন্যে-মো-এল্" (Nye-mo-el), (২) "রিন্ জোং" (Rhyn-Zong), বা "দ্যেন্ জোং" (Dyen-Zong), এবং "আরোঙ্-ল্যাঙ্" (Arong-Lyang)।

লেপচারা নিজেদের পরিচয় দেয় "মুতন্চী-রোঙ্ (Mutan-chee-Rong) বা এককথায় "রোঙ্" (Rong) বা "রোওঙ্ (Ro-ong) বলে। সিকিমে এরা অবশ্য "মুন্‌ন্ত্রী" বা "মোন্পা" নামেও পরিচিত। লেপচা বা লাপচে শব্দটি নেপালী ভাষা থেকে এসেছে। "লাপচা" (Lapcha) একটি পার্বত্য মাছের নাম বিশেষ। এই মাছ অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির। এবং যেহেতু লেপচারা অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ সেহেতু নেপালীরা লেপচাদের "লাপচা" (Lapcha) বা "লাপচে" (Lapche) বলে সম্বোধন করে থাকে। এই লাপচা বা লাপচে শব্দ থেকেই বর্তমানে প্রচলিত "লেপচা" শব্দের উৎপত্তি। অবশ্য এই লেপচা বা লাপচে শব্দটির স্থানান্তরে অর্থভেদ রয়েছে। যেমন "দুষ্টভাষী" বা "দুর্বোধ্যভাষীর" অর্থ হিসেবেও লেপচা শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ইউরোপীয় তথাকথিত গবেষকদের অনুসন্ধানে অবশ্য এই শব্দটির অর্থ "জবরদখল জমির অধিকারী"। আবার কোথাও কোথাও শব্দটির অর্থ "গোপনে মিলিত হওয়ার স্থান" হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকৃত অনুসন্ধানে জানা গেছে যে যেহেতু ইউরোপীয় তথাকথিত গবেষকদের প্রায় সকলেই দোভাষীর মাধ্যমে তথ্যানুসন্ধানে লিপ্ত ছিলেন এবং যেহেতু লেপচা সমাজে পরিচিত নেপালী ভাষা সম্বন্ধেও উক্ত গবেষকদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিলো সেই হেতু শব্দের প্রকৃত অর্থ সংগ্রহ ও নির্ণয় করা তাদের পক্ষে সুদূরপরাহত ছিলো। সুতরাং লেপচা, লাপচে বা লাপচা শব্দের প্রকৃত অর্থ যে এক নিরীহ প্রকৃতির জীব বা মানুষ এ সম্পর্কে বাদানুবাদের প্রশ্ন উঠে না। কেননা লেপচারা প্রকৃতই এক অতি নিরীহ প্রকৃতির মানুষ এ সম্বন্ধে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই।

"মুতন্‌চী-রোঙ্‌" (Mutanchee-Rong) কথাটির উৎপত্তি বিষয়ে লেপচা সমাজে বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রচলিত আছে।

প্রথম অনুসন্ধানে জানা যায় লেপচা সমাজে দাসেথিং বা তাসেদিং-এর নামটি বিশেষ পরিচিত ও প্রচলিত। এরা এঁকে সৃষ্টিকর্তা জ্ঞানে স্মরণ করে থাকে। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় দাসেথিং হিমালয়ের গুহাকন্দরে লেপচাদের জন্য তেত্রিশটি গুপ্ত-ধনের কোষাগার সৃষ্টি করে গেছেন। পৃথিবীতে যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দেখা দেবে তখন দাসেথিং আবার দেখা দেবেন।

কোষাগারের দ্বার তখন উন্মুক্ত করা হবে এবং সঞ্চিত ধন দৌলত তিনি ছড়িয়ে দেবেন পৃথিবীতে। পৃথিবীর মানুষ এইভাবে রক্ষা পাবে। দাসেথিং-এর পুনরাগমনে বিশ্বাস করে লেপচারা।

"মুতন্‌চী-রোঙ্‌" বা "রোওঙ্‌" শব্দটির অর্থ অপেক্ষাকারী।

দ্বিতীয় অনুসন্ধানে জানা যায় পূর্বে সিকিমে ভালো পথঘাট ছিলো না। সিকিমে লবণ পাওয়া যেতো না। সে সময় ভারতবর্ষ থেকে সিকিমে লবণ সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। উত্তর তিব্বতে সে সময় লবণ পাওয়া যেতো। সে জন্য সিকিম থেকে লোকেরা উত্তর তিব্বতে লবণ সংগ্রহে যেতো। মুদ্রার বিনিময় সে সময়ে উভয় রাজ্যেই তেমন প্রচলিত ছিলো না।

দ্রব্য বিনিময় পদ্ধতি অনুসারে পরিমাণ মতো মধু সরবরাহ করতো সিকিমের অধিবাসীরা। আর সম পরিমাণ ওজনের লবণ আসতো তার বিনিময়ে। এইসব কারণে সিকিমের নানাস্থানে বসবাস সুরু করে বহিরাগতেরা। এরা ব্যবসায়িক কারণবশতঃ অনেকেই দেশে ফিরে যেতো না। এইভাবে সিকিম থেকে উত্তর তিব্বতের পথে পথে বহু বসতি গড়ে ওঠে। এবং এইসব বাসস্থানগুলিই বিশ্রামাগার হিসাবে ব্যবহার করা হতো। লেপচা ভাষায় বিশ্রাম-স্থানের অর্থ "রোওঙ্-ল্যাঙ্" (Ro-ong-Lyang)। আর এই বিশ্রামস্থানের আশেপাশে যারা বসতি গড়েছিলো তাদের বলা হতো "রোওঙ্" বা "রোঙ্"। আগেই বলা হয়েছে লেপচা ভাষায় তাদের পরিচয় "রোঙ্" নামেই।

এই তথ্য থেকে ধরা যেতে পারে যে এক অর্থে বিশ্রামাগার কথাটির অর্থ "রোওঙ্-ল্যাঙ্", যেমন বিশ্রামকারীদের বলা হতো "রোওঙ্"। ঠিক তেমনই বিশ্রামস্থানের আশেপাশে যে বহিরাগতেরা প্রয়োজনের খাতিরে বাসস্থান গড়তো তাদেরও বলা হতো "রোওঙ্"।

তৃতীয় অনুসন্ধানে জানা যায় যে প্রাচীনকালে সিকিমের অধিবাসীদের ভৌগোলিক জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায় তারা মনে করতো যে এই বিপুল বিশ্বের একমাত্র অধিবাসী তারাই। তারা নিজেদের হিমালয়ের প্রিয় সন্তান বা "আমু-সা-আচে" (Amu-Sha-Achey) বলে মনে করতো। আমার বিশ্বাস "মুতন্চী" শব্দটির উৎপত্তি এই "আমু-সা-আচে" থেকেই।

চতুর্থ অনুসন্ধানে জানা যায় যে "শিং" শব্দটিকে লেপচা ভাষায় "আরোঙ্" (Arong) বলে। শিং-এর মতো খাড়া খাড়া পাহাড়ে ঘেরা সিকিম রাজ্যকে তাই বলা হতো "আরোঙ্-ল্যাঙ" আর এই আরোঙ্ শব্দ থেকেই "রোওঙ্" বা "রোঙ্" শব্দটি এসেছে।

এই হিসাবে সিকিমের আদিবাসিন্দাদের বলা হয় "মুতন্চী-রোঙ"।

৪। পরবর্তী বসতি ও বর্তমান অবস্থিতি

বর্তমান সিকিম রাজ্য ছাড়া এখন লেপচাদের বসতি রয়েছে নেপাল রাজ্যের ইলাম প্রদেশের তরাই অঞ্চলে, ভুটান রাজ্যের সারবোঙ্, গ্যালিফো, ফুণ্ট্শোলীঙ্ প্রভৃতি অঞ্চলে দার্জিলিঙ্ জেলার কার্সিয়ঙ্, কালিম্পঙ্ ও সদর মহকুমায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শহর এলাকায় যে সব লেপচাদের চোখে পড়ে তাদের অধিকাংশই নিজেদের স্বকীয়ত্ব হারিয়ে ফেলেছে। লেপচাদের আদি কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এখনও বেঁচে আছে বনজংগল অধ্যুষিত পাহাড়ী গ্রামে-গ্রামান্তরে।

দার্জিলিঙ্ সদর মহকুমার তাকদা (Takda), লাভ্দা (Labhdah), লামাহট্ট (Lama-hatta), রিম্বিক্ (Rim-bick), পুলুং-ডুঙ্ (Pulung-dung), ভানজং (Bhanjang), কায়জলে (Kaijaley) কার্সিয়ঙ্ মহকুমার মামরীং (Mam-ring), তোর‍্যাক্ (Toryok), সীদঙ্ বা সিটং (Sidong বা Sittong), লাটপঞ্চার (Latpanchar), ল্যাংকু (Lyanku), রোল্যাক্ (Rolyok), সেল্‌ফ্যু (Selphyu) এবং কালিম্পঙ্ (কালেবুঙ্ ?) মহকুমার গোরুবথান (Gorubothan), গীত-দাবলীং (Geetdabling), সমালবোং (Samalbong), চেগরা (Chegra), সমথার (Somthar), সোর‍্যোক (Soryok), পেদং (Pedong) নীমবোং (Neembong), পুডুং (Pudung), সীন্দেবোং (Seendeybong), বোং-ডুংরা (Bong-dungra), কাঙ্কেবোং (Kankeybong), সালীমবোং (Saleembong), মুনসঙ্ (Munsang) প্রভৃতি অঞ্চলে লেপচা বসতি দেখা যায়। এছাড়াও পাবরিংতার (Pabringtar), লোলে (Loley), সিংতম্ (Singtam), মারতম্ (Martam) প্রভৃতি অঞ্চলেও লেপচা বসতি দেখা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। লেপচাদের দৈহিক আকৃতি ও অন্যান্য জাতি উপজাতিসমূহের সহিত সাদৃশ্য

লেপচাদের সাথে মংগোলীয়দের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলে অনেকে মনে করে থাকেন। কিন্তু কয়েকটি মূল বিরোধিতার ফলে এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নয়।

লেপচাদের ডিম্বাকৃতি মুখাবয়ব, বলিষ্ঠ কাঁধ ও মধ্যমাকৃতি দেহ মনে করিয়ে দেয় রোমান ও গ্রীসিয়দের কথা। জাতিতত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা এই সাদৃশ্যের কথা মোটামুটি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবেন কেননা শুধুমাত্র দৈহিক সাদৃশ্যই নয় লেপচাদের আদি পোশাক পরিচ্ছদ ও আভরণ প্রভৃতির সংগে রোমান ও গ্রীসিয়দের যথেষ্ট মিল আছে।

লেপচাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য সম্বন্ধে আর একটি অনুসন্ধানে জানা যায় যে উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় সীমান্ত প্রদেশে শতদ্রু নদীর পাড়ে "হাংগারাঙ্" (Hangarang) নামক জায়গায় এবং লাদাকের (Ladak) "লারী" (Laree) অঞ্চলে বসবাসকারী পার্বত্য উপজাতির সংগে লেপচাদের সাদৃশ্য প্রচুর। এই অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতীয়দের ভুলবশতঃ কেউ কেউ চীনাবংশজাত "তাতার" (Tatar) উপজাতির সংগে তুলনা করে থাকেন কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরা তিব্বতীয় জাতিগোষ্ঠীর একটি শাখা মাত্র। যদিও প্রকৃত বিচারে লেপচা উপজাতি তিব্বতীয় গোষ্ঠী বা ভোট উপজাতি থেকে পৃথক্।

অপর একটি অনুসন্ধানে জানা যায় যে সিকিমের আদিবাসী এই লেপচা উপজাতি ও আসামের খাসিয়া উপজাতি প্রকৃত বিচারে

একই উপজাতিগোষ্ঠীর দুটি পৃথক শাখা মাত্র। কিন্তু দৈহিক সাদৃশ্যের বিচারে খাসিয়া উপজাতি জাপানী, চীনা ও মাঞ্চুরিয়ানদের একই গোষ্ঠীর বলে ধারণা হয় কিন্তু লেপচা উপজাতির সংগে অত্যন্ত ক্ষীণ পরিমাণে তিব্বতীয় গোষ্ঠীর সাদৃশ্য থাকলেও আফ্রিকার নিগ্রোগোষ্ঠীর সংগে সাদৃশ্য প্রচুর।

তবে এ সমস্ত অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত অতিক্রম করে একটি কথাই বলা যায় যে লেপচা উপজাতির সংগে রোমান ও গ্রীসিয়দের যে পরিমাণ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় সে অনুপাতে অন্যান্য সাদৃশ্য স্বতঃসিদ্ধ নয়।

রংগীন ডোরাকাটা পোষাক পরিধান করে লেপচা পুরুষেরা। সাদা ও লাল, লাল ও কালো, কালো ও সাদা বা বাদামী ডোরা কাটা পশমী মোটা কাপড়ের হাঁটু অবধি এক ধরনের পোষাক ব্যবহার করে থাকে এরা। হাল্কা রংএর তুলনায় গাঢ় রংএর প্রাধান্য এদের পোষাকে চোখে পড়ে। মাথায় রংগীন অর্থাৎ প্রায়ই সাদা, লাল অথবা লাল, কালো ডোরাকাটা পশমী কাপড়ের তৈরী হেলমেট বা শিরস্ত্রাণ জাতীয় টুপি ব্যবহার করে। এই টুপি প্রস্তুতে পাতলা কঞ্চি জাতীয় বাঁশের ব্যবহার দেখা যায়। কোমরে ঝোলানো থাকে শেষাংশ ঈষৎ বাঁকা লোহার তৈরী অস্ত্র যার লেপচা ভাষায় নাম "বম্‌পক্‌" (Bompok)। এই অস্ত্রটি ছুরি বা ছোরা জাতীয় নয়।

কাস্তের মুখ যদি সোজা আকারে তৈরী করা যায় তবে সেটির আকার প্রায় এদের ব্যবহৃত অস্ত্রের মতো হবে। এই অস্ত্রটি এদের নিত্যসংগী। অবশ্য এরা যখন পুরোপুরি জংগলের বাসিন্দা ছিলো তখনই এই অস্ত্র এদের নিত্যসংগী ছিলো।

লেপচা মেয়েরা এক ধরনের আলখাল্লা জাতীয় পোষাক ব্যবহার করে। আলখাল্লা অর্থে পোষাকের দুই প্রান্ত খোলা অথচ লুংগির মতো ব্যবহারযোগ্য পোষাক বুঝতে হবে। এই

পোষাক সাধারণতঃ রেশমী বা সুতির তৈরী হয়। রোমান, মিশরীয় বা গ্রীসিয় মেয়েরা যে ধরনের পোষাক ব্যবহার করতো এরাও ঠিক অনুরূপ পোষাকই ব্যবহার করে থাকে। দেহের উপরাংশে অত্যন্ত ঢিলা ব্লাউজ জাতীয় পোষাক ব্যবহার করে।

লেপচা মেয়েরা দেখতে প্রায়ই রোমান, মিশরীয় বা গ্রীসিয় মেয়েদের মতো। চেহারা ও পোষাকের এই সাদৃশ্য হেতু আমার অনুমান যে নিশ্চয়ই কোনোকালে গ্রীসিয় ও রোমানদের সংগে লেপচাদের যোগাযোগ ঘটেছিলো। কেননা অনুসন্ধানে জানা গেছে যে উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি গোষ্ঠীর সংগে লেপচাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আমার সিদ্ধান্ত এই যে উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় সীমান্ত অঞ্চলের পার্বতীয় উপজাতি-গোষ্ঠী প্রকৃত প্রস্তাবে লেপচা উপজাতিরই একটি অংশ এবং এই লেপচা উপজাতির সংগে মধ্যপ্রাচ্যের জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ ছিলো।

কৃষ্টিকলার দিকটিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। লেপচাদের খেলাধুলার মধ্যে তীরধনুক চালনা একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। লেপচাদের পালাপার্বণে এখনও তীরধনুক চালনার প্রতিযোগিতা চোখে পড়ে। অপর পক্ষে রোমান ও গ্রীসিয়দের মধ্যেও তীরধনুকের জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

ধর্ম প্রসংগেও অনুসন্ধানে দেখা যায় যে প্রাচীন রোম ও গ্রীসে এবং পারস্য দেশেও প্রস্তর ও অগ্নির উপাসনার প্রচলন ছিলো। লেপচাদের মধ্যেও অগ্নি ও প্রস্তর পূজার প্রচলন আছে। নির্দিষ্ট অধ্যায়ে এ প্রসংগে আলোচনা করা হয়েছে।

বিশেষতঃ কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রতীক হিসাবে এরা ছোটোবড়ো পাথরের সাহায্যে স্তূপ তৈরী করে উপাসনা করে থাকে। লেপচারা নিজেদের কাঞ্চনজঙ্ঘার সন্তান বলেই বিশ্বাস করে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই বিশ্বাসই সহজে

প্রতীয়মান হয় যে সম্ভবতঃ এই লেপচা উপজাতির সংগে রোমান, গ্রীসিয় ও পারস্য সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটেছিলো এবং যার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে আজ আমরা লেপচাদের মধ্যে ঐসব আঞ্চলিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সন্ধান পাই। অথবা একথা বিশ্বাস করা শক্ত নয় যে সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় সীমান্ত প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে লেপচা উপজাতির সন্ধান পাওয়া যায় তাদেরই মাধ্যমে ও সাহায্যে ভারতের সংগে রোমান, গ্রীসিয় ও পারস্য সভ্যতার যোগাযোগ ঘটে।

একথাও সত্য যে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পরবর্তী কালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও পাঞ্জাবে বেশ কিছুকাল গ্রীক রাজারা রাজত্ব করে গেছেন। এবং যার ফলশ্রুতি স্বরূপ এখন বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় গ্রীক ভাষার প্রভাব দেখা যায়।

তিব্বতীয়রা লেপচাদের "মন্" নামে সম্বোধন করে থাকে। অবশ্য "মন্" শব্দটির অর্থ সাধারণভাবে তিব্বত ও ভারতবর্ষের মাঝামাঝি সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের বোঝায়। অবশ্য অনুসন্ধানে জানা যায় তিব্বতীয়রা শুধু মাত্র লেপচাদের ক্ষেত্রেই এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। "মন্" নামে একটি উপজাতির সন্ধান ব্রহ্মদেশের পেগু প্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে পাওয়া যায়। এদের সংগে সিকিমের লেপচাদের আকৃতিগত, কৃষ্টিগত সাদৃশ্য প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। কোনো কোনো সমাজ-বিজ্ঞানী মনে করেন যে সম্ভবতঃ সিকিমের আদিবাসী লেপচা এবং ব্রহ্মদেশের "মন্" উপজাতি একই বৃহৎ উপজাতি গোষ্ঠীর শাখা মাত্র।

জাপানী জাতিতত্ত্ববিদ্দের ধারণা যে সিকিমের আদিবাসী লেপচা উপজাতির একটি শাখা নিম্ন তরাই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং তারা কালক্রমে "খাসিয়া" (Khasis) উপজাতি হিসাবে পরিচিত হয়।

আকৃতিগত বিচারেও তারা লক্ষ্য করেছে যে লেপচারা ভারতীয় বা শ্বেতকায় কোনো জাতি বা উপজাতি সম্ভূত নয় বরং এদের সংগে জাপানী, চীনা এবং মাঞ্চুরিয়ানদের আকৃতিগত সাদৃশ্য প্রচুর।

আমার সিদ্ধান্ত এই যে, লেপচা উপজাতি যে সিকিমের আদিবাসী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তবে কালে কালে এই উপজাতির সংগে তিব্বতীয় ও চীনা রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে প্রভূত পরিমাণে। নানা পরিস্থিতিতে এদের একটি শাখা তরাই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং কালক্রমে জাতিতত্ত্ববিদ্‌দের দৃষ্টিতে কোচ, মেচ লিম্বু ও লেপচে (লেপচা ?) ইত্যাদি উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।

পশ্চিম বাংলার অপর একটি ক্ষুদ্র উপজাতি "রাভা"। রাভা উপজাতির একটি অংশ কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমা ও জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমায় বাস করে। রাভা উপজাতির সৃষ্টির ইতিহাস সম্বলিত একটি উপাখ্যানে জানা যায় যে "রঙ্‌কারাঙ্" (Rang-Karang) রাভা উপজাতির সৃষ্টিকর্তা "ঋষি-বে" (Rishi-bay) বা "ঋষি-দেবতা" (Rishi-devata)-র আবাসস্থল। তাঁর নির্দেশে "তাক্‌মানব্রা" (Takmanbra), "পৃথিমী" (Prithimee) বা পৃথিবী পরিচালনা করেন। ঋষিদেবতা তাঁর সৃষ্ট মানবসমাজকে মোট চারটি ভাগে বিভক্ত করেন। এরা পরবর্তী কালে চার সহোদর ভাই হিসাবেই পরিচিত হয়। এরা হলো কোচ, মেচ, লিম্বু ও লেপচে (লেপচা ?) উপজাতি। পরবর্তী কালে এদের মিশ্রিত একটি পৃথক্ উপজাতি-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় এবং তারা "রাবা-তাঙ্" (Raba-Tang) নামে পরিচিত হয়। "রাবা-তাঙ্" শব্দটির অর্থ "রাবা" উপজাতি। "রঙ্‌কারাঙ" স্থানটিকে তিব্বত অঞ্চলের কোনো স্থান মনে করা হয়।

২। লেপচা গৃহনির্মাণ পদ্ধতি ও উপকরণ

লেপচাদের গৃহনির্মাণ পদ্ধতি একটু বিচিত্র ধরনের। কাঠ ও বাঁশের সাহায্যে এরা এদের বাসগৃহ নির্মাণ করে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই গৃহনির্মাণে একটিও পেরেকের (লোহার কাঁটা) ব্যবহার হয় না। কাঠ বা বাঁশ এমনভাবে খাঁজ কেটে জোড়া দেওয়া হয় যে পেরেকের কোনো প্রয়োজনই হয় না। আমি তথ্যানুসন্ধানকালে সিকিমে ও দার্জিলিঙ্ জেলায় এই ধরনের অভিনব পদ্ধতিতে নির্মিত গৃহ দেখেছি। কালিম্পঙ্ মহকুমার "নাস্সে" (Nassey) গ্রামে আমি স্বচক্ষে এইরূপ একটি ছোটো বাসগৃহ নির্মাণ করতে দেখেছি। পরিমিতি ও কারিগরী জ্ঞান এদের অপরিসীম। আগেকার দিনে বিরাট আকারের গৃহনির্মাণ করা হতো। কাঠের খুঁটির উপরে, কাঠের তক্তার সাহায্যে মাচা তৈয়ারী করা হতো। এই মাচার উপরে বড়ো বড়ো চারটি ঘর তৈরী করা হতো।

(১) শয়ন ঘর (২) গোলা ঘর (৩) অতিথিদের জন্য ঘর (৪) রান্নাঘর।

প্রত্যেক ঘরের বাইরের দেওয়ালে শুধুমাত্র দুটি বা তিনটি জানালা জাতীয় ফাঁক থাকতো। এই জানালা বা ফাঁকগুলি সাধারণতঃ "গথিক শিল্প" অনুকরণে করা হতো। এই ঘরগুলির সামনে ও পিছনে দুটি প্রশস্ত বারান্দা থাকতো। চারখানা ঘরের নীচের অংশে মাচার নীচে ঘেরা দেওয়া হতো এবং সেখানে রাত্রিতে গৃহপালিত পশু, জীবজন্তুদের রাখা হতো।

এই ধরনের গৃহ বর্তমানে নাই বললেই চলে। পুরোনো গৃহগুলির যথাযথ সংস্কার হয় না। সংস্কার হলেও আধুনিক রুচি-সম্মতভাবে করা হয়।

বর্তমানে কাঠের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি, বনজ সম্পদের অপ্রাচুর্যতা

ও প্রধানতঃ এই অভিনব পদ্ধতিতে গৃহনির্মাণে অহেতুক লজ্জাবোধ-হেতু লেপচাদের মধ্যে সনাতনী পদ্ধতিতে গৃহনির্মাণ আর তেমন চোখে পড়ে না।

বাঁশ ব্যবহারের কতকগুলি অভিনব পদ্ধতি এদের মধ্যে প্রচলিত আছে। আদি দেবতা তাসেথিঙ্ স্রষ্ট এই বাঁশ লেপচাদের সাংসারিক জীবনে একটি অপরিহার্য বস্তু।

কচি বাঁশের মূল কেটে এরা "সাকৃত-বী" (Sakrit-Bee) নামে এক ধরনের আহার্য প্রস্তুত করে। এছাড়া বাঁশের সাহায্যে এরা নানা ধরনের পাত্র, মাদুর, দড়ি, বাঁশী প্রস্তুত করে।

লেপচারা যে অস্ত্র ধারণ করে সেটির ঢাকনা এই বাঁশের সাহায্যে তৈরী করা হয়। লেপচা গ্রামে গেলে আর একটি জিনিস চোখে পড়বে তা' হলো বাঁশের সাহায্যে জলবহন করার পাত্র। চার-পাঁচ হাত লম্বা একটি বিশেষ ধরনের পাকা বাঁশের অংশ-বন্ধনীর ভিতরের ভাগকে যত্নের সংগে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়। এর ফলে নীচের (গোড়ার) অংশ বা গিঁট ছাড়া অন্য অংশগুলি খোলা হয় এবং অনায়াসেই ঝর্ণার গায়ে বাঁশখানা ছুঁইয়ে রাখলেই জল ভর্তি হয়ে যায়। তারপর সেটিকে "নাম্-লু" নামক দড়ির সাহায্যে পিঠের উপরে তোলা হয় এবং কপালের পিছন দিক থেকে ঝুলিয়ে বহন করা হয়। নেপালীদের মধ্যেও এই পদ্ধতিতে জলবহন করার রীতি আছে।

লেপচাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও পেশা

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় লেপচারা নেপালীদের তুলনায় পরিশ্রমশীল নয়। সেহেতু কায়িক পরিশ্রমে নেপালী ও অন্যান্য পার্বত্য জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় লেপচাদের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। এক সময় চা-বাগিচার শ্রমিকের কাজে এরা যোগ দেয় কিন্তু নেপাল থেকে নেপালীদের সংগে তারা পাল্লা দিয়ে পারে না। দার্জিলিঙ

জেলার চা-বাগিচা সৃষ্টির গোড়াপত্তনের সময়ে বিদেশী মিশনরীরা (বিশেষতঃ, জার্মান মিশনরীরা) কিছুদিন চা-শ্রমিকের কাজও করেন। এই সময় লেপচাদের মধ্যে অধিকাংশই ভূমিহীন চা-শ্রমিক ছিল বলে জানা যায়।

মূলতঃ লেপচারা কৃষিজীবী। কৃষিকার্যই একমাত্র মুখ্য পেশা হিসাবে দেখা যায়। আদিবাসভূম সিকিমে লেপচাদের অধিকারে ভূসম্পত্তি ছিলো। কিন্তু পরবর্তী কালে কপট ব্যবসায়ীদের কবলে পড়ে তাদের অধিকাংশের জমিই হাতছাড়া হয়ে যায়। "বারো মাসে তেরো পার্বণের জাত" এবং "খাও-দাও-স্ফূর্তি করো" এই বাক্যে বিশ্বাসী লেপচা উপজাতি সহজ ও সরল মনে সামান্য টাকার বিনিময়ে জমির স্বত্ব পরিত্যাগ করে। এবং যার ফলে বর্তমানে একদা প্রভূত ভূসম্পত্তির মালিক লেপচারা ভূমিহীন সামান্য ক্ষেত-শ্রমিকে পরিণত হয়েছে।

খোদ সিকিমেও শাসকসম্প্রদায় লেপচা উপজাতির উন্নয়নে ও রক্ষণাবেক্ষণে কোনো সদিচ্ছাই পোষণ করেনি। নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে লেপচা উপজাতি সম্প্রতি বাঁচার জন্য এক নতুন পথের হদিশ পেয়েছেন। সিকিমে নবপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র এই পথ দেখিয়েছে।

লেপচাদের মধ্যে একাংশ মাছ ধরা ও শিকার করে থাকেন। শুয়োর, ভেড়া পালন করাও এদের একটি মুখ্য উপজীবিকার অংশ বলা যেতে পারে। তবে পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে পশুপালন ব্যাপকভাবে চালু থাকায় এখানেও লেপচারা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে আছে বলা যেতে পারে। ভেড়া পালনে "গুরুঙ্‌" সম্প্রদায় (নেপালী জাতিভুক্ত) অত্যন্ত পারদর্শী।

সাধারণতঃ লেপচাদের চাষের পদ্ধতিও একটু বিচিত্র। ধাপে ধাপে চাষ (Terrace) করার কায়দাটি লেপচাদের মধ্যে প্রচলিত। যদিও কোনো কোনো তথ্যানুসন্ধানী মনে করেন যে লেপচাদের মধ্যে

"ঝুম্" পদ্ধতিতে চাষ করা হতো, কিন্তু বর্তমানে এর কোনো অস্তিত্ব নাই। জীবিকা অর্জনের তাগিদে ও বহিরাগত শত্রুদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে লেপচারা যখন ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করতো অর্থাৎ যখন স্থায়ীভাবে বসবাস করা সম্ভব ছিলো না তখনই এদের মধ্যে "ঝুম্" প্রথায় চাষবাস করার রীতি ছিলো মনে হয়। এখন আধুনিক পদ্ধতিতেই চাষবাস করা হয়। সাধারণতঃ ধান, গম, ভুট্টা ও কোকো চাষ এরা করে। কিছু কিছু অঞ্চলে এলাচ, আদা ও কমলার বাগান দেখা যায়। এলাচ ও আদা দুটি অর্থকরী উৎপাদন হলেও বহিরাগত মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে এর অর্থ খুব কমই লেপচাদের হাতে পৌঁছয়। সাধারণতঃ বড়ো জাতের এলাচের ক্ষেতে, এলাচ কাঁচা অবস্থায় থাকাকালীন নানাধরনের বিষধর সাপের উৎপাত হয়। এই সাপেরা কাঁচা এলাচে সঞ্চিত মধু খেতে আসে। এলাচ-বাগিচার দরিদ্র লেপচাদের আত্মীয় পরিজনদের কতোজনকে এই বিষধর সাপের উৎপাতে প্রাণ হারাতে হয় তার সীমাপরিসীমা নাই। এদের মধ্যে দুধের ও মাখনের ব্যবসা করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

সে যাই হোক, লেপচাদের অর্থ নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এদের অধিকাংশের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচু।

বর্তমানে লেপচা সমাজে শিক্ষাদীক্ষার প্রসার হওয়ায় অনেকে ভালো সরকারী চাকুরী করেন। তবে একটি উপজাতির সর্বাঙ্গীণ আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করলে এদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য বলে মনে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

লেপচা লিপি, বর্ণমালা ও ভাষা

জেনারেল মেইনওয়ারীং বলেন—"লেপচা ভাষা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন ভাষা।"

লেপচা পৌরাণিক উপকথায় জানা যায় যে লেপচা লিপির উৎপত্তি হয় পাঁচজন লেপচা পণ্ডিতের দ্বারা। তাদের নাম যথাক্রমে (১) তারগে (Turgey) (২) সায়ুন্ (Sayyun) (৩) গোলে (Goley) (৪) তংরাব (Tangrab) এবং (৫) দুরীং (Dureeng)।

এদের সৃষ্ট এই লেপচা লিপিসমূহ মংগোল উপজাতিসমূহের লিপিসমূহের মধ্যে তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট পর্যায়ের বলে মনে করা হয়ে থাকে। এদের সৃষ্ট লিপিসমূহের এক একটির একাধিক অর্থ আছে। উচ্চারণ বিধি অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক নয়। লিপিসমূহের সাংকেতিক চিহ্নসমূহ প্রায়শঃই আরবীয় লিপি-সমূহের পর্যায়ে পড়ে। স্বভাবতঃই মনে হয় এই লিপিসমূহের প্রবক্তা পাঁচজন লেপচা পণ্ডিত নন বরং আরবীয় পণ্ডিতেরাই এই লিপিগুলি সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয় অনুসন্ধানে জানা যায় যে সিকিমের তৃতীয় শাসনকর্তা ছাগদোর নামগ্যাল (Chagdor Namgyal) যাঁকে "সর্ববিজেতা বজ্রবহ" মনে করা হয়ে থাকে তিনিই সর্বপ্রথম লেপচা লিপির বা বর্ণমালার সৃষ্টি করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে ছাগদোর নামগ্যাল-সৃষ্ট বর্ণমালাতেই পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মীয় পুস্তকসমূহ লিখিত হয়। তিব্বতীয় ভাষা থেকে বৌদ্ধধর্মীয় যে সমস্ত পুস্তক অনূদিত হয় তা সবই ছাগদোর সৃষ্ট বর্ণমালাতেই হয়।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ছাগদোর নামগ্যালের সৃষ্ট লেপচা

লিপির প্রচলনের আগে লেপচাদের মধ্যে যে আদি লিপির প্রচলন ছিলো এবং সেই লিপির মাধ্যমে যে সব পুস্তক ও নথিপত্র ছিলো তা ধ্বংস করা হয়। এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে ছাগদোর-সৃষ্ট বর্ণমালার পূর্বে লেপচা ভাষায় বহু জ্ঞানগর্ভ পুস্তক লেখা হয়েছিলো। লেপচারা মূলতঃ জড়-চৈতন্যবাদী। আদি লিপিতে লেপচাদের আদি ধর্ম সম্বন্ধে বহু মূল্যবান পুস্তক লিখিত হয়েছিলো কিন্তু সেগুলির আর হদিশ পাওয়া যায় না। তিব্বত থেকে আমদানীকৃত বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের নিমিত্ত আদি লিপিতে লিখিত সমস্ত ধর্মীয় ও জ্ঞানগর্ভ পুস্তক ধ্বংস করার বিশেষ প্রয়োজন ছিলো।

যাই হোক ভাষাতত্ত্ববিদদের সিদ্ধান্ত যে লেপচা লিপি "ইন্দো-ব্রহ্ম" (Indo-Burmese) লিপিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অবশেষে কোনো কোনো গবেষক একে ভাষাগত দিক থেকে "তিব্বতীয়-চীনা" (Tibeto-Chinese) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন।

লেপচা ভাষাকে অনেকে এই "তিব্বত-চীনা" গোষ্ঠীর "তিব্বত-হিমালয়" (Tibeto-Himalaya) ভাষা-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন।

এমন এক সময় ছিলো যখন সিকিমের রাষ্ট্রভাষা ছিলো লেপচা ভাষা। এমন কি সুদূর অতীতে সিকিম ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা-সমূহে লেপচা ভাষার মাধ্যমে কাজকর্ম চলতো। এই ভাষা যে সংস্কৃত, হিব্রু ইত্যাদি ভাষার চেয়েও পুরাতন এ বিষয়ে অনেক গবেষকই মত প্রকাশ করেন।

আরও অনুসন্ধানে জানা গেছে যে ব্রহ্ম দেশের পেগু অঞ্চলের উপজাতি "মন্" (Mon) যে ভাষায় কথাবার্তা বলে লেপচা ভাষা তাদের সমগোত্রীয়। যে সকল ভাষাতত্ত্ববিদ্ লেপচা ভাষাকে "ইন্দো-ব্রহ্ম" লিপিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, এই সিদ্ধান্ত তাঁরা সমর্থন করেন। তবে বর্তমানে প্রচলিত লেপচা ভাষার মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণে তিব্বতীয় ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়।

এই মিশ্রণ যে ছাগদোর নামগ্যাল কৃত লেপচা ভাষার সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করছে তা বলাই বাহুল্য। লেপচাদের আদি ভাষা, লিপি ধ্বংসের মূলে যে একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিলো তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কেননা পরবর্তী কালে নিজস্ব ভাষাহীন একটি সম্পূর্ণ পঙ্গু উপজাতি কখনই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক।

তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে ছাগদোর নামগ্যাল কৃত লেপচা বর্ণমালার বহু পূর্বেই লেপচা আদি বর্ণমালার অস্তিত্ব ছিলো, কিন্তু ছাগদোর নামগ্যাল কর্তৃক পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত বা মতান্তরে পরিবর্তিত লেপচা বর্ণমালাই প্রচারযন্ত্রের সাফল্যে আদি ও অকৃত্রিম লেপচা বর্ণমালা হিসাবে মান্যতা পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে লেপচা ভাষায় নাকি মুণ্ডারী ভাষার প্রভাব রয়েছে। কিন্তু তেমন কোনো উদাহরণ সহজলভ্য নয়।

বর্তমানে লেপচা ভাষাভাষীর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমানতার দিকে দৃষ্টি দিলে মনে হয় যে এর কারণ প্রধানতঃ অপর উপজাতি ও জাতির সংগে অবাধ রক্তের সংমিশ্রণ। লিম্বু উপজাতির সংগে লেপচাদের অবাধ বিবাহ প্রচলিত ছিলো। পরবর্তী কালে সে কারণেই লক্ষ্য করা যায় যে লিম্বুদের সংগে আচারগত ও ধর্মগত বিশেষ একটা পার্থক্য এদের মধ্যে নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে দার্জিলিঙ্ জেলায় লেপচা অধ্যুষিত অঞ্চলে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে লেপচা ও তিব্বতী ভাষার প্রচলন দেখা যায়। পরবর্তী কালে সিকিম ও দার্জিলিঙ্ অঞ্চলে যখন বহিরাগতেরা বসতি স্থাপন করে তখন স্বাভাবিক কারণেই লেপচাদের ভাষা মুখ্য স্থান অর্জনে সক্ষম হয় না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দার্জিলিঙ্ জেলার তিনটি পার্বত্য মহকুমায় শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে হিন্দী একটি অন্যতম স্থান লাভ করে। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে অপর ভাষা মুখ্যস্থান লাভ করার ফলে লেপচাদের

দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষাও পরিবর্তন লাভ করে। এইভাবে দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা পরিবর্তনের ফলে লেপচাদের পারিবারিক ব্যবহারের ভাষার উপরেও তার প্রভাব পড়ে। ধীরে ধীরে এদের পারিবারিক ব্যবহারের ভাষাও মূলতঃ অপ্রধান হয়ে পড়ে। উপরন্তু লেপচা সমাজে অবাধ রক্ত-সম্পর্ক স্থাপনের ফলে বর্তমানে লেপচা ভাষা মৃতপ্রায়। খৃষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় ও লেপচা সমিতির মাধ্যমে অবশ্য বর্তমানে পুনরায় লেপচা ভাষা প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা সুরু করা হয়েছে।

লেপচা ভাষায় কয়েকটি প্রতিশব্দ

বাংলা	লেপচা	সঠিক উচ্চারণ
মাথা	অথ্যাক্	Ath-yak
চুল	অচ্যোং	Ach-yong
কান	অন্যোর	An-yor
কপাল	আকিং	Ak-ing
ভ্রূ	নিকচোং	Nik-chong
চোখ	আমিক্	Am-ick
নাক	তোকনম্	Tok-nam
গোঁফ	বুংমাৎ	Bung-mat
দাঁত	অফো	Af-oe
গাল	তাগ্রিয়ো	Tagri-oe
গলা	পতোপ্	Pa-top
কাঁধ	তকপোং	Takpo-ong
বুক	কারগ্যু	Karg-yu
পেট	তবোক	Tab-ok
হাত	আক্যু	Ak-yu
আঙুল	কয্যোক্	Kaj-yok
নখ	পঞ্চি	Panch-i
মণিবন্ধ	কতেম্	Kat-em

বাংলা	লেপচা	সঠিক উচ্চারণ
পা	অদ্যাং	Ad-yang
জুতা	ল্বোম্	Lwo-ng
(খাদ্যদ্রব্য)		
ভাত	জো	Jo
ধান	জোমোন	Jomon
গম	কিয়ো	Kiyo
যব	কচের	Kacher
ভুট্টা	কচুং	Kach-ung
জোয়ার	মোং	Mong
আলু	বুক্	Buk
কমলা	দমরাও	Damrao
	(ছোলং)	Chholong
কলা	করগোয়ক	Kargo-yok
	(কুরডুং)	Kurdung
পেয়ারা	আম্বক	Ambok
	(আম্বিয়েক)	Ambiyek
কুমড়ো	তংগৎ	Tangath
টমেটো	বীরুপৎ	Beerupath
আদা	অগরাক্ হিং	Agrak-Hing
এলাচ	তংবরাপ্	Tangbarap
আম	আম্বিপৎ	Ambipath
রাইশাক	বীফং	Beephong
সরিষা	কনডাং	Kandang
সীম	তুম্বিৎপৎ	Tumbithpath
শশা	শরিয়েৎ	Sariyeth
মাংস	মো-অন্	Mo-an
মাছ	মু	Mu
ডিম	হিকভি	Hikthi
সরিষার তৈল	য়বনম্	Yabnam

বাংলা	লেপচা	সঠিক উচ্চারণ
(বিবিধ)		
ফুল	রীব্	Reeb
সূর্য	সচোক্	Sachok
চাঁদ	লভো	Labho
আকাশ	তল্যাং	Talyang
পাহাড়	ল্যাং	Lyang
ছোটো নদী	উং কিউং	Woong-kiwuong.
নদী	উং দোক্	Woong-dok
ঝর্না	ভোং	Bhong
তোষক	নন্লোপ্	Nanlop
লেপ	দম্কাপ্	Damkap
বালিশ	থ্যেকোম্	Thyekom
টুপি	থ্যাক্তুক্	Thyaktuk
পুরুষের পোষাক (মূল পরিধেয়)	থ্যোক্-র-দুম্	Thyok-ra-dum
পুরুষের উধর্বাঙ্গের পোষাক	তোগো	Togo
কোমর বন্ধনী	ন্যেম্রিক্	Nyemrik
তরবারি	রংবান্	Rangban
ছোটো অস্ত্র	বানপোক্ (বমপোক্)	Banpok Bampok
ঈষৎ তীক্ষ্ণ অস্ত্র	বান্মোক্	Banmok
দীর্ঘ অস্ত্র	পাইয়ুক	Paiyuk
শাড়ি জাতীয় বস্ত্র (স্ত্রী)	দ্যুমদ্যিম্	Dyumdyim
জামা (স্ত্রী)	তোগো	Togo
মালা	ল্যাক্	Lyak
ঝোলা	তবল্যাক্ (তবল্যাগ্)	Tablyak Tablyag

বাংলা	লেপচা	সঠিক উচ্চারণ
মদ্যপানের নিমিত্ত নলজাতীয় বাঁশের চোংগা	পিহিপ্	Pihip (Pipe ?)
মদ্যপাত্র	পথেক্	Pathek
ধনুক	সিলি	Sili
তীর	চ্যোং	Chyong
বাঁশ	পো	Po
রাস্তা	লোম্	Lom
কাগজ	ছিগো	Chhigo
বই	ছ্যো	Chhyo
মহিষ	মহী	Mahee
গরু	বিগ্লং	Biglang
গাভী	বিগো	Bigo
ছাগল	সা-আর	Sa-ar
মুরগী	হিক্ রোম্	Hik-rom
মোরগ	হিক্ বু	Hik-bu
মোরগছানা	হিকপ্	Hikap
কুকুর	কুজু	Kuju
বিড়াল	আলিয়্যু	Aliyu
শূকর	মোন্	Monn
পাখী	ফো	Pho
নমস্কার	খাম্রি	Khamri
সকাল	ল্যুকরং	Lyukrang
সন্ধ্যা	নমউন্	Namyun
দুপুর	সিইয়াঁম্	Sieyaam
অন্ধকার	দনোক্	Danok
রৌদ্র	সচোক	Sachok

৩। লেপচা মতে দিন, বার, মাস ও বছর গণনা :

সাধারণ চলিত নিয়মানুসারে লেপচারা দিন ও রাত্রিকে মোট ৫টি ভাগে ভাগ করেছে। নীচে ছকের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা হলো।

(১) দিন ও রাত্রির অংশভাগ

ক্রমিক সংখ্যা	সময়	অংশ	লেপচা ভাষান্তর
১	সূর্যোদয় থেকে বেলা বারোটা	সকাল	লু-ক্রোঙ্ (Lu-krong)
২	বারোটা থেকে দুটো	দুপুর	সীম্ কীত্ (Seem-keet)
৩	দুটো থেকে ছয়টা	বিকেল	নাম্ মোম্ (Nam-Mom)
৪	ছয়টা থেকে রাত আটটা	সন্ধ্যা	সোহলা (Sohla)
৫	আটটা থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্ত	রাত্রি	সোনাপ্ (Sonap)

(২) বারের হিসাব

ক্রমিক সংখ্যা	বাংলা বার	লেপচা বার
১	রবিবার	মেসেই-য়াক্ (Mesei-ak)
২	সোমবার	আনসেই-য়াক্ (Unsei-ak)
৩	মঙ্গলবার	লোঙ্সেই-য়াক্ (Longsei-ak)
৪	বুধবার	ন্যেন্সেই-য়াক্ (Nyensei-ak)
৫	বৃহস্পতিবার	সাগ্মতসেই-য়াক্ (Sagmatsei-ak)
৬	শুক্রবার	ফেয়িতসেই-য়াক্ (Faithsei-ak)
৭	শনিবার	পানজেনসেই-য়াক্ (Panjensei-ak)

(৩) মাসের হিসাব

লেপচা ভাষায় মাসের নাম "ঞোম্" (Nyom)। সাধারণতঃ লেপচাদের মাসের সংখ্যা বারো। কিন্তু প্রত্যেক তিন বছর পরপর একটি বিশেষ মাস এই বারো মাসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এই মাসটির নাম "তাফা" (Tapha)। চান্দ্রমাসের হিসাব অনুসারে এরা মাসগুলিকে ভাগ করে নিয়েছে। সৌরমাসের সংগে চান্দ্রমাসের হিসাবের যাতে কোনো প্রকার গোলমাল না হয় সে জন্যই তারা প্রতি তিন বছর পরপর একটি অতিরিক্ত মাস সংযোজন করে প্রতি তৃতীয় বছর তেরো করে নেয়।

লেপচা মাসের তালিকা নীচে দেওয়া হলো :

ক্রমিক সংখ্যা	বাংলা মাস	লেপচা মাস
১	বৈশাখ	নুম্‌কুম্ (Num Kum)
২	জ্যৈষ্ঠ	ব্লুঙ্ (Blung)
৩	আষাঢ়	নুম্ চুম্ (Num Chum)
৪	শ্রাবণ	পারভিঙ্ (Parbhing)
৫	ভাদ্র	গ্লু (Gloo)
৬	আশ্বিন	ইত (It)
৭	কার্তিক	রা (Raa)
৮	অগ্রহায়ণ	মার্ (Marr)
৯	পৌষ	কুর্‌ঞিত্ (Kurnyith)
১০	মাঘ	কারসোঙ্ (Kursong)
১১	ফাল্গুন	থোন্ (Thon)
১২	চৈত্র	সুম্ (Soom)

(৪) বারো বছরের চাকা

লেপচাদের মধ্যে একটি চমকপ্রদ বিশ্বাসের প্রচলন আছে। এটির নাম দেওয়া হয়েছে "বারো বছরের চাকা" অর্থাৎ এরা প্রত্যেকটি বারো বছরকে একটি চাকার সংগে তুলনা করে, চাকার সমান বারো অংশের একটি অংশকে এক একটি বছর হিসাবে এরা ভাগ করে নিয়েছে। এদের বিশ্বাস একটি বছর সুরু হয় বিধাতার এক একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য। এদের এই বিশ্বাসের সংগে বিধাতার উদ্দেশ্যের প্রশ্ন জড়িত করে এরা এই এক একটি বছরের এক একটি প্রতীক নাম স্থির করেছে। এদের বিশ্বাস এই প্রতীকের পশ্চাতে বছরটি কেমন যাবে তার ইংগিত রয়েছে।

নীচে এই "বারো বছরের চাকার" একটা তালিকা এবং ফলাফল প্রকাশ করা হলো।

বারো বছরের

ক্রমিক সংখ্যা	লেপচা নাম	প্রতীক চিহ্ন	বিশেষত্ব
১	ক্লক্	ইঁদুর	সঞ্চয়ী
২	লঙ্	বলদ	শান্ত
৩	সাং হোঙ্	বাঘ	উগ্র
৪	কাম থোঙ্	ঈগল	উচ্চমনা
৫	সাদের	উজ্জ্বল জ্যোতি	বদরাগী
৬	বুরি	সাপ	নীচমনা
৭	উন্	টাট্টু ঘোড়া	কর্মঠ
৮	লোক্	মেষশাবক	শয়তান
৯	সুহু	বানর	চঞ্চল
১০	হিক্	শেয়াল	সংযত
১১	কুম্	কুকুর	সজাগ
১২	মোন্	শূকর	অলস

(৫) লেপচা মতে নক্ষত্রসমূহ

লেপচাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে মোট চোদ্দটি নক্ষত্র রয়েছে। এর মধ্যে নয়টি নক্ষত্রকে তারা জন্ম নক্ষত্র বলে।

সেগুলি হলো—

(১) ছিকা বা চিহীকা (২) নীমক্ (৩) সান্থিঙ্ (৪) জীজোঙ্ (৫) লাসেরি বা লাহ্সেরি (৬) থোগোল্ (৭) হুম্বোল্ (৮) গোকাল্ (৯) গুম্বোল্।

এই নয়টি জন্ম নক্ষত্র ছাড়া বাকী পাঁচটি নক্ষত্রের নাম যথাক্রমে (১০) ওয়োঙ্থ্যাঙ্ (১১) মীয়র (১২) সোক্ (১৩) লাই (১৪) লোউতা।

(৬) লেপচা মতে সংখ্যা গণনা :

বাংলা সংখ্যা	লেপচা সংখ্যা	ইংরাজী উচ্চারণ
এক	কাৎ	Kath
দুই	ন্যেৎ	Nyeth
তিন	সাম্	Samm
চার	ফ্লি	Phuli
পাঁচ	ফুঙোও	Phungwo
ছয়	ত্রোক	Trokk
সাত	ক্যকিয়ক্	Kyakiyak
আট	কক্যু	Kakyu
নয়	ক্যকিয়ত্	Kyakiyath
দশ	কতি	Kati
এগারো	কথাপ্	Kathaph
বারো	নেথাপ্	Nethaph
তেরো	সামথাপ্	Samthaph
চোদ্দ	ফ্লিথাপ্	Phulithaph
পনেরো	উঙোথাপ্	Woongothaph

বাংলা সংখ্যা	লেপচা সংখ্যা	ইংরাজী উচ্চারণ
ষোলো	ত্রোক্থাপ্	Trokthaph
সতেরো	কক্যিয়ক্থাপ্	Kakyiyakthaph
আঠারো	কক্যুথাপ্	Kakyuthaph
উনিশ	কক্যিয়ৎথাপ্	Kakyiyaththaph
কুড়ি	খাকাৎ	Khakath

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে লেপচা গণনায় কুড়ি সংখ্যার পরে অন্য কোনো সংখ্যার প্রচলন নাই। একুশ সংখ্যার গণনায় কাৎ (এক) খাকাৎ (কুড়ি) অর্থাৎ কাৎখাকাৎ-কাৎ (Kathkhakath-Kath) বলা হয় এবং পরবর্তী সংখ্যাগণনার ক্ষেত্রেও ঠিক সেই ভাবে কাৎখাকাৎ-নেৎ ইত্যাদি হিসাবে গণনা করা হয়। একশত সংখ্যাকে লেপচা ভাষায় কুঙোও খাকাৎ (পাঁচ কুড়ি) বলা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

১। লেপচা সমাজব্যবস্থা

বহু সমাজবিজ্ঞানী লেপচা সমাজকে মাতৃতান্ত্রিক বলেছেন। কিন্তু বর্তমানে লেপচা সমাজকে মাতৃতান্ত্রিক বলা চলে না। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার জন্যই হোক অথবা কালের বিবর্তনেই হোক লেপচা সমাজ বর্তমানে কমবেশী পিতৃতান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। অবশ্য তথাপি লেপচা সমাজে মহিলার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে।

লেপচাদের মধ্যে বর্তমানে অবাধ রক্তসম্পর্কের সম্মতি থাকলেও একসময়ে শুধু মাত্র লিম্বু উপজাতির সংগেই প্রধানতঃ এদের বিবাহাদি হতো। লেপচা সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথা নাই বললেই চলে। তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রম গ্রামাঞ্চলে এখনও দেখা যায়।

লিম্বু উপজাতির সংগে অবাধ রক্তসম্পর্ক হলেও "সিকিমী-ভুটিয়া" (Sikkimese-Bhutia) সম্প্রদায়ের সংগেও রক্তসম্পর্কহেতু লেপচাদের কিছু অংশ ভুটানে প্রবেশ লাভ করে। বর্তমানে ভুটান রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে যে সব লেপচার সন্ধান পাওয়া গেছে তারা যে এই রক্তসম্পর্কের ধারক এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই।

এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য এই যে ভুটিয়া (Bhutanese) উপজাতিটির তিনটি ভাগ রয়েছে। অর্থাৎ ভুটিয়া উপজাতিকে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

যথা—(১) তিব্বত থেকে আগত ভুটিয়া (Tibeto-Bhutanese)। যারা প্রয়োজনের তাগিদে তিব্বতে বসবাস করে এবং তিব্বতীদের সংগে রক্তের সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

(২) ভুটান থেকে আগত বা খোদ ভুটানের ভুটিয়া (Bhutanese)।

(৩) সিকিমে বসবাসকারী ভুটিয়া (Sikkimese-Bhutia)।

(৪) শের্পা শ্রেণীভুক্ত ভুটিয়া।

শের্পা শ্রেণীভুক্ত ভুটিয়া উপজাতির সৃষ্টি হয়েছে তিব্বতী-ভুটিয়া (Tibeto-Bhutanese) ও লেপচা উপজাতির সংগে রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে। এ তথ্য অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস। কেননা শের্পা শ্রেণীভুক্ত ভুটিয়া উপজাতির মধ্যে একযোগে লেপচা ও তিব্বতী সুলভ মুখাবয়ব ও দৈহিক সাদৃশ্য এবং ভুটিয়া সুলভ কঠোর পরিশ্রমী মনোভাব দেখতে পাওয়া যায়।

বর্তমানে যে স্বল্পসংখ্যক লেপচা রয়েছে তাদের মধ্যেও এই অবাধ রক্ত-সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। লেপচা যুবকগণ অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত জীবনে আপন সমাজে বিবাহে বিশেষ আগ্রহী নয়। আবার অপর পক্ষে লেপচা যুবতীরাও আপন জাতির মধ্যে বিবাহে অনাগ্রহী। তারা অধিকাংশই নেপালী, ভুটিয়া, তিব্বতী, এমন কি বাঙালী সমাজেও প্রবেশ লাভ করেছে।

লেপচাদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ছিলো এবং এখনও গ্রামাঞ্চলে এই ব্যবস্থাই চোখে পড়ে। কোনো লেপচা মেয়েকে অপর কোনো জাতি বা উপজাতির ছেলের সংগে বিবাহ দিলে তাদের সন্তানেরা মাতার গোত্রের অধিকারী হয়। খাশিয়াদের মধ্যেও মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কথা জানা যায়। লেপচাদের মধ্যে স্বগোত্র বিবাহের রীতি প্রচলিত নাই। এক শ্রেণীর সংগে অপর শ্রেণীর বিবাহের প্রচলন বা রীতি আছে।

য়ুরোপীয় তথাকথিত গবেষকরা বলেছেন যে লেপচাদের মধ্যে কোনো শ্রেণী বিভাগ নাই। কিন্তু এমন একটি তথ্য সংগ্রহ করা গেছে যার দ্বারা একথাটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায় যে লেপচাদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ পূর্বেও ছিলো এবং আজও আছে।

মুখ্যতঃ লেপচা উপজাতির শ্রেণীগোত্র এই পাঁচটি।

(১) স্যাঙ্-দেন্-মু (Syang-den-Mu), (২) লিঙ্-সিঙ্-মু

(Ling-Sing-mu), (৩) হি-মু (Hi-mu), (৪) কর্থাক্-মু (Karthak-mu) এবং (৫) থিকুঙ্-স্যালঙ্ (Thikung-Syalang)। অন্যান্য যে কয়টি শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি প্রধানতঃ স্থানভিত্তিক। স্থানভিত্তিক বা আঞ্চলিক-ভিত্তিক এই রকম ৩১ (একত্রিশ)টি গোত্রের বা শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

এই শ্রেণীগুলির নাম ও নামকরণের যৌক্তিকতা বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সিকিম রাজ্যের সিংতম্ (Singtam), গ্যাংটক (Gangtok), মারতম্ (Martam), সিংলা (Singla), রংপো (Rongpo) ও পশ্চিম সিকিমের বিভিন্ন প্রত্যন্ত প্রদেশে, নেপাল রাজ্যের ইলাম (Ilam), চিশোপানি (Chisopani), তাতোপানি (Tatopani), পশুপতি (Pasupati) প্রভৃতি অঞ্চল, ভুটান রাজ্যের থিম্পো (Thimpo), পারো (Paro), ফুনছোলিঙ্ (Phuntsholing), গ্যালিফোগ্ (Gyaliphog), সারবঙ্ (Sarbong), প্রভৃতি অঞ্চলে এবং দার্জিলিঙ্ জেলার তিনটি পার্বত্য মহকুমা অর্থাৎ, সদর মহকুমা দার্জিলিঙ্, কালিম্পঙ্ ও কার্সিয়ঙ্ মহকুমার অসংখ্য গ্রামে গ্রামান্তরে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

পূর্বে উল্লিখিত "শের্পা-ভুটিয়ার" উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মত-পার্থক্য দেখা যায়। ১৯৬১ সালের ভারতীয় জনগণনার নথিপত্র অনুসারে "শের্পা-ভুটিয়া" উপজাতিকে নেপাল থেকে সিকিমে আগত ভুটিয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ সম্পর্কে মোট দুটি মত দেখা যায় :

(১) Tibeto-Bhutanese (তিব্বতে বসবাসকারী ভুটিয়া) + Lepcha (লেপচা-সিকিমের আদিবাসী) = Sherpa (শের্পা) বা Sherpa-Bhutanese

(২) নেপালে বসবাসকারী ভুটিয়া উপজাতি (পরবর্তীকালে সিকিমে আগত) + লেপচা (সিকিমের আদিবাসী) = Sherpa (শের্পা)।

লেপচারা যে একত্রিশটি গোত্র বা মতান্তরে শ্রেণীবিভক্ত তার বিবরণ দেওয়া হলো :

নং	গোত্র বা শ্রেণীর নাম	ইংরাজী উচ্চারণ	যে অঞ্চলে বসবাস করে
১	তুক্‌নিল্‌-মু	Tuknil-mu	চুমথাঙ্‌ (সিকিম)
২	সম্পাপুতসো-মু	Sampaputso-mu	নামথাঙ্‌ (সিকিম)
৩	তারগোক্‌-মু	Turgok-mu	রিনছেনপোঙ্‌ (কালিম্পঙ্‌)
৪	রাংগেন-মু	Rangen-mu	ইলাম (নেপাল)
৫	ফেঙ্‌বু-মু	Fengbu-mu	ইলাম (নেপাল)
৬	নম্‌ছা-মু	Namchha-mu	নাম্‌চু (নেপাল)
৭	ধেলিং-মু	Dheling-mu	ইলাম (নেপাল)
৮	সম্‌দের-মু	Somder-mu	ইলাম (নেপাল)
৯	কোত্রা-মু	Kotra-mu	ইলাম (নেপাল)
১০	বর্মেক-মু	Bormek-mu	বর্ম্যোক্‌ (সিকিম)
১১	সঙ্‌-ফুঙ্‌-মু	Song-Fong-mu	ইলাম (নেপাল)
১২	নাম্‌চি-মু	Namchi-mu	নাম্‌চি (নেপাল)
১৩	সমলীঙ্‌-মু	Somleeng-mu	নেপাল
১৪	মাঙ্‌ মুঙ্‌-মু	Mang-mung-mu	দেনতাম্‌ (সিকিম)
১৫	তগলুঙ্‌-মু	Toglung-mu	দালাম (নেপাল)
১৬	সমত্রুল-মু	Samtrul-mu	সমদোঙ্‌ (সিকিম)
১৭	নমফোঁগ্‌-মু	Namphong-mu	নম্‌ফোক (?)
১৮	রতু-মু	Rotu-mu	রিনছেনপোঙ্‌ (কালিম্পঙ্‌ ?)
১৯	কবি-মু	Kobi-mu	তুমলোঙ্‌ (সিকিম)
২০	ফোগ্‌রম্‌-মু	Fogram-mu	লিংতাম (সিকিম)
২১	রঙ্‌-ম্রোঙ্‌-রঙ্‌-মু	Rong-Wong-Rong-mu	লিংতাম (সিকিম)
২২	রিনয়ত রম্‌-মু	Rinyat-Ram-mu	রংগীত নদীর উৎসমুখে

২৩	রথোঙ্-রম্-মু	Rathong-Ram-mu	রাদোঙ্ (সিকিম)
২৪	রীঙ্-বীত্-রম্-মু	Reeng-beet-Ram-mu	রংগীত নদীর উৎসমুখে
২৫	লাসোগ্-মু	Lasog-mu	তাসেদিঙ্ বা লাসোগ (সিকিম)
২৬	কালেগ্-মু	Kaleg-mu	কালেগ নদীর উৎসমুখে
২৭	লিঙ্দেম্-মু	Lingdem-mu	লিঙ্দেম্ (সিকিম)
২৮	রীনাগ্-মু	Reenag-mu	মঙ্ত্রী (সিকিম)
২৯	য়ুগচাম্-মু	Yugcham-mu	য়ুগচাম্ (সিকিম)
৩০	রিম্পোঙ্-মু	Rimpong-mu	রমতেক্ (সিকিম)
৩১	নবী-মু	Nobi-mu	দিকচু (ভূটান)
৩২	সুন্য়ীত-মু	Sunyit-mu	সুনীয়ত (ভূটান ?)
৩৩	সিতলিং-মু	Sittling-mu	সিতলিং (সিকিম)
৩৪	ফোনীং-মু	Fonning-mu	ফোনীং (সিকিম)

২। লেপচা বিবাহরীতি

অনুসন্ধানে জানা যায় যে কিছুকাল আগেও পিতৃব্যের মৃত্যু হলে কাকীমাকে বিবাহ করা যেতো। বড়ো ভাই-এর মৃত্যু হলে ছোটো ভাই তার বৌদিকে বিবাহ করতে পারতো। তবে বিভিন্ন জাতি উপজাতির সংগে রক্ত-সম্পর্ক স্থাপন হবার জন্য এই নিয়ম এখন সমাজে অচল।

লেপচাদের মধ্যে বহুবিবাহ রীতির প্রচলন নাই। স্ত্রীর মৃত্যুর পরই স্বামী পুনর্বিবাহে অনুমতি পায়। অবশ্য স্ত্রী বন্ধ্যা হলে, স্বামী অন্য বিবাহ করতে পারে। স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকে তার একটি বেণী কেটে ফেলতে হতো। এখন অবশ্য এমন কোনো রীতি নাই। স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোকেরা যদি তাকে ফিরিয়ে নিতে চায় তবে স্বামীর অর্ধেক সম্পত্তি-

সহ তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তবে স্ত্রী নিজ ইচ্ছানুসারে স্বামী-গৃহ ত্যাগ করলে সম্পত্তির অধিকারিণী হবে না। তবে বর্তমানে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সংগে লেপচাদের বিবাহাদির ফলে এই সব পুরোনো সামাজিক আইনকানুন বাতিল হয়ে গেছে।

লেপচাদের মধ্যে "মাংগি-বিহে" অর্থাৎ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মেয়ে চেয়ে নেওয়ার পদ্ধতি আছে। তবে একই বংশে এবং গোত্রে বিবাহ হয় না। সম্পুর্ণ ভিন্ন বংশে, গোত্রে অর্থাৎ যেখানে রক্তের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নাই তাদের মধ্যেই বিবাহ হতে পারে। মাদক পানীয় ও মাংস লেপচাদের বিয়েতে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। যদি কোনো লেপচা ছেলে একটি লেপচা মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তবে সরাসরি কোনো ব্যবস্থাই কার্যকরী হবে না। পাত্রপক্ষ থেকে পাত্রীর কাকা বা মামার কাছে প্রস্তাব পাঠাতে হবে। পাত্রীর অভিভাবকদের কাছে এই প্রস্তাব পাঠানোর পদ্ধতিটি একটু বিচিত্র ধরনের। পাত্রপক্ষের প্রতিনিধিরা এক পূর্ণপাত্র "কোদো" (মাদক পানীয় বিশেষ) বা লেপচা ভাষায় "মোং-চি", কিছু পরিমাণ চাল এবং একটি মোরগ নিয়ে পাত্রীর কাছে যায় এবং প্রস্তাব উত্থাপন করে। পাত্রীর কাকা বা মামা এই প্রস্তাব প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রহণ করে পাত্রীর মা ও বাবার সংগে আলোচনা করে থাকে। এই সময় পাত্র-পাত্রীর বংশ, গোত্র বা শ্রেণী, অবস্থা, সংগতি ইত্যাদি বিশদভাবে অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে। এরপর পাত্রীর বাবা ও মা পাত্রের বাবা ও মার কাছে প্রস্তাবে সম্মতি বা অসম্মতি সম্বন্ধে তৃতীয় পক্ষের (ঘটক শ্রেণীর) সাহায্যে জানিয়ে থাকে। লেপচা ভাষায় এই তৃতীয় পক্ষকে বলে "পামী-বু" (Pamee-Bu)। পাত্রীপক্ষের দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্মতি প্রস্তাবে পাত্রপক্ষ রাজী হলে তৃতীয়পক্ষ পাত্রপক্ষের তরফ থেকে এক পূর্ণপাত্র "কোদো" ও একটি টাকা নিয়ে পাত্রীর মা ও বাবার কাছে যায়। এই সময় পাত্রপক্ষকে পাত্রীর মা, বাবা ও ভাইবোনেদের

জন্য কমপক্ষে পাঁচটি টাকা এবং মামা ও কাকাদের জন্য পাঁচটি টাকা দিতে হয়। এরপর পাত্রপক্ষ পাত্রকে পাত্রীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার দিন স্থির করে থাকে। এই সময় পাত্রকে পাত্রীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাবতীয় জিনিসপত্র নিজেকে বহন করে নিয়ে যেতে হয়। এর দ্বারা নাকি সংসারের সমস্ত ভার বহন করার শক্তি পাত্রের আছে এটাই প্রমাণ হয়ে থাকে।

পাত্রপক্ষকে অভ্যর্থনা করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাত্রী-পক্ষের আত্মীয়স্বজন পাত্রীর বাড়ি থেকে বেশ কিছু দূরে এগিয়ে এসে অপেক্ষা করে। তাদের সংগে থাকে মাদক পানীয় ও মুরগীর মাংস। এই প্রথাকে বলে "লোম্-ল্বগসোগ্" (Lomm-Lwogsog)।

পাত্রকে পাত্রীর বাড়িতে প্রবেশ করবার আগে আর একটি বিচিত্র প্রথার সম্মুখীন হতে হয়। পাত্রীর বাড়ির বয়স্কা মহিলারা পাত্রপক্ষকে বিশেষ করে পাত্রকে লঙ্কার ধুনা এবং বিছুটি পাতা দিয়ে স্বাগত জানায়। এই অবস্থার হাত থেকে তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পেতে হলে যথাসম্ভব জিনিসপত্র ঐ সব মহিলাদের দিয়ে দিতে হয়।

পাত্র পাত্রীর বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে পাত্রকে আসন দেওয়া হয় এবং পাত্রের সামনে একজোড়া মুরগীর ঝলসানো মাংস, ভাত আর নানা প্রকার মিষ্টি রাখা হয়। এরপর পাত্রপক্ষের অন্যান্যদের খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয়। খাওয়া শেষ হলে পাত্রীপক্ষের সর্বাপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তি পাত্রকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করে থাকে। পাত্রকে এই সব প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত চিন্তা করে দিতে হয়।

এরপর পাত্রকে যদি পাকা কথা দেওয়া হয় তবে পাত্র পাত্রীকে একটি গরু, একটি গাভী অথবা কমপক্ষে পনেরোটি টাকা দিয়ে থাকে। পাত্রীপক্ষ অত্যন্ত নিপুণতার সংগে গরু ও গাভীটিকে পরীক্ষা করে দেখে। যদি কোনো প্রকার খুঁত দেখতে পায় তখন পাত্রপক্ষকে জানায় যে পাত্রীর এই ধরনের কোনো প্রকার খুঁত

নাই। এই অবস্থায় পাত্রপক্ষ একটি লোহার তৈরী অস্ত্র, একটি তামার তৈরী বাসন, একপাত্র মাদক পানীয় এবং আরও পনেরোটি টাকা দিয়ে পাত্রীপক্ষকে বিবাহে রাজী করায়। এইভাবে রাজী হলে পাত্র, পাত্রীকে রূপার তৈরী এক জোড়া বালা ও একটি টাকা দিয়ে থাকে। এসময় পাত্রীর মা ও বাবাকে পাত্র নানা প্রকার জিনিস দেয়। এরপর চারদিন পাত্রীর বাসায় পাত্রকে থাকতে হয়। প্রায় তিন বছর পর্যন্ত পাত্রকে পাত্রীর বাসায় নানাপ্রকার জিনিসপত্র দিতে হয়। তিন বছর অতিক্রান্ত হলে পাত্র পাত্রীকে নিজের বাসায় নিয়ে আসার অধিকার লাভ করে। পাত্রী তার ভাবী স্বামীর (?) সংগে চলে আসার সময় একটি শূকর, একপাত্র চাল, একপাত্র মাদক পানীয় ও একটি টাকা নিয়ে যায়। পাত্রীর সংগে পাত্রীর কোনো আত্মীয় বা আত্মীয়াও যেতে পারে। এই প্রথাকে বলে—"ন্যোম্-জুম্" (Nyom-jum)। পাত্রী ভাবী শ্বশুরবাড়ি পৌঁছুলে পথের ক্লান্তি দূর করবার জন্য তাকে সিদ্ধ মাংস, ভাত প্রভৃতি খেতে দেওয়া হয়। এই প্রথাকে বলে "ন্যোম্-জ্যো-অলসুদ্" (Nyom-Jyoalsud)।

পাত্রের সংগে পাত্রীর মিলনকে সামাজিক মর্যাদা দেওয়ার জন্য একটি গরু হত্যা করা হয় এবং গরুটির মাথা কুলদেবতাকে উৎসর্গ করে খুব জাঁকজমক করে ভোজ দেওয়া হয়। এই ভোজ ও উৎসব তিন চারদিন ধরে চলে। ভোজ শেষ হলে মেয়ে তার বাপের বাড়ি চলে যায়। সে সময়ে তার সংগে একটি শূকর, একপাত্র মাদক পানীয় এবং পনেরোটি টাকা দেওয়া হয়।

এইভাবেই আগের দিনে লেপচা সমাজে বিবাহ সম্পন্ন হতো। বর্তমানে একমাত্র "জড়-চৈতন্যবাদী" লেপচাদের মধ্যেই এই প্রথা চালু আছে। তবে অর্থনৈতিক কারণে এই দেওয়া ও নেওয়ার পরিমাণ ও রীতি বেশ কিছু পরিমাণে সীমিত হয়েছে।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লেপচারা অবশ্য সনাতন প্রথা আংশিক মেনে

চললেও বৌদ্ধ-উপাসনালয় "গোম্ফা" (Gompha)তে লামার পরিচালনায় বিবাহাদি সম্পন্ন করে থাকে।

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী লেপচারা খ্রীষ্ট-উপাসনালয় গীর্জায় খ্রীষ্টিয় মতে বিবাহাদি সম্পন্ন করে থাকে।

যে সব লেপচা ইসলামধর্মাবলম্বী বা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সংগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তাদের মধ্যে সনাতন পদ্ধতি মেনে চলার কোনো গরজ দেখা যায় না।

তবে "জড়-চৈতন্যবাদী" লেপচা সমাজে তাদের সনাতন পদ্ধতিকে মেনে চলার একটা আপ্রাণ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় এবং যা সত্যই প্রশংসনীয়।

৩। মৃতের সংকার রীতি ঃ সনাতন প্রথা

লেপচা সমাজে মৃতদেহ সংকারের একাধিক রীতির প্রচলন দেখা যায়। সনাতন প্রথায় বিশ্বাসী লেপচারা মৃতদেহকে কবরস্থ করে।

মৃত্যুর পরে লেপচা পুরোহিত বঙ্-থিঙ্ (Bong-Thing) বা স্ত্রীজাতীয় পুরোহিত মোন্ (Mon) লেপচা ধর্মগ্রন্থ "নাম থর" (Nam Thar) পাঠ করে। মৃত-ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় যে এখন আর তার সংগে জীবিত প্রাণীর কোনো সম্পর্ক নাই। যদি মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কোনো বঙ্-থিঙ্ বা মোন্-এর সন্ধান না পাওয়া যায় তবে "নাম থর" পাঠে সক্ষম কোনো ব্যক্তির দ্বারা এই কার্যটি সমাধা করা হয়। যদি দিবালোকে মৃতদেহকে সংকার করা হয় তবে তাকে বলে "সুঙ্-বাম্" (Sung-Bam) এবং রাত্রিকালে "সুঙ্-ল্যোন্" (Sung-Lyon)।

মৃতদেহকে সংকারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার আগে দেহের সমস্ত আবরণ ও আভরণ খুলে ফেলা হয় এবং ঈষদুষ্ণ গরম জলের সাহায্যে স্নান করান হয়। এরপর মৃতের মুখ সাদা কাপড়ের

সাহায্যে সম্পূর্ণ ঢেকে দেওয়া হয়। এবং এই আচ্ছাদনের উপরে একটি মুদ্রা ও সামান্য পরিমাণ চাল রাখা হয়। এ ছাড়া পুরুষ মৃতের জন্য একটি তীর ও ধনুক, স্ত্রী মৃতের জন্য একটি কাস্তে এবং অল্পবয়স্ক মৃতের জন্য একটি চিরুণী সংগে দেওয়া হয়।

মৃতদেহকে সরাসরি ঘরের দরজা দিয়ে বাইরে বের করা হয় না। ঘরের পাটাতন খুলে তার নীচ দিয়ে অথবা জানালা দিয়ে মৃতদেহকে বাইরে আনা হয়। এ প্রসংগে বলা প্রয়োজন যে লেপচাদের বাড়িগুলি কাঠের তৈরী মাচার উপর তৈরী করা হয়। সেক্ষেত্রে ঘরের পাটাতন খুলতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

লেপচাদের কবরের গহ্বর মোটামুটি তিন ধরনের হয়।

(ক) "কোক্" (Kokk)—এই গহ্বরগুলির আকার গোলাকার হয়। এই প্রকার গহ্বরে মৃতদেহকে বসিয়ে রাখা হয়।

(খ) "কোক্-দেন্" (Kokk-den)—এই গহ্বরগুলির আকার চতুর্ভুজ। বিশেষতঃ লেপচা পুরোহিতদের মৃত্যুর পর এই ধরনের গহ্বরে কবরস্থ করা হয়।

(গ) "কোক্-ব্লী" (Kokk-Blee)—এই গহ্বরগুলির আকার ত্রিভুজ।

এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মৃতদেহকে সর্বদাই যথাসম্ভব উত্তরমুখী করে কবরস্থ করা হয়। এই কবরস্থানকে লেপচা ভাষায় বলে "কোক্-ব্রোঙ্-ল্যাঙ্" (Kokk-Brong-Lyang)। প্রত্যেক কবরের উপরে একটি স্মারক পাথর রাখা হয়। এই স্মারক পাথরকে বলে "কোক্-বুম্" (Kokk-Boom) এবং স্মারক-স্তম্ভকে বলে "কোক্-দী" (Kokk-Dee)।

মৃতদেহকে কবরস্থ করার পর বঙ্-থিঙ্ বা মোন্ মৃতের উদ্দেশ্যে কিছু পরিমাণ মাদক পানীয় একটি বাঁশের তৈরী পাত্রের মধ্যে রেখে আসে।

মৃতের আত্মীয়স্বজনেরা ঘরে ফিরে এসে বঙ্-থিঙ্ বা মোন্ সাত

প্রকারের পাতার সাহায্যে পবিত্র জল ঘরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। এইভাবে জলসিঞ্চন দ্বারা পবিত্রকরণকে লেপচা ভাষায় বলে "ফীক্" (Feek) বা "অফীক্" (Afeek)।

এরপর মৃত্যুর তিনদিন পরে আত্মীয়স্বজনেরা কিছু পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী ও মাদক-পানীয়—"চী" (Chee) ঐ কবরের উপর রেখে আসে। এরপর আরও পাঁচদিন পরে বঙ্-থিঙ্ ও মোন্ মোরগের রক্ত মৃতের ঘরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয় ও শুদ্ধ করে। মৃত্যুর পর সাতদিন অতিবাহিত হলে মোন্ মৃতের আত্মার শান্তির জন্য পূজা করে। এ সময় মৃত ব্যক্তির আত্মা নাকি মোন্-এর মাধ্যমে তার মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি বর্ণনা করে। যদি মৃত ব্যক্তি কাউকে ঋণ দিয়ে থাকে অথবা ঋণ নিয়ে থাকে তা' সবই সে মোন্-এর মাধ্যমে জানায়। এইসব ক্রিয়াকাণ্ড শেষ হওয়ার পরে মোন্ পবিত্র জলের সাহায্যে আহার্য সামগ্রী ইত্যাদি শুদ্ধিকরণ করে।

বৌদ্ধ প্রথা

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লেপচারা মৃতদেহ দাহ করে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লেপচাদের শাস্ত্রীয় সংস্কারে বঙ্-থিঙ্ বা "মোন্"-এর বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। লামা (বৌদ্ধ পুরোহিত) এক্ষেত্রে সমস্ত কিছুর বিধান ও নির্দেশ দেন।

শবদাহ সমাপ্ত হলে লামা সেই ভস্মের কিছু অংশ বৌদ্ধ-গোম্ফায় নিয়ে আসে। কিছু অংশ মৃতের আত্মীয়স্বজনকে দেওয়া হয়। বৌদ্ধ-লামা মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনায় তিন থেকে চারদিন ধরে পূজাপাঠের ব্যবস্থা করে। চতুর্থ অথবা পঞ্চম দিনে লামা মৃতের আত্মীয়স্বজনদের সংগে করে মৃতদেহ যেখানে দাহ করা হয়েছিলো সেইস্থানে যায়। যদি সেখানে কোন পায়ের ছাপ দেখা যায় তবে লামা মনে করে যে মৃতের আত্মা এখনও মৃতের বাড়িঘরের আশেপাশে আছে ও বন্ধন কাটিয়ে যেতে পারছে না। তখন

লামার পৌরোহিত্যে পূজাপাঠ করা হয় ও মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা করা হয়। এরপর পায়ের ছাপ আর দেখা না গেলে মৃতের আত্মা স্বর্গে গেছে এই বিশ্বাসে ভস্মরাশি নিকটের কোন ঝর্না বা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। নদীতে বা ঝর্নায় ভস্মরাশি উৎসর্গ করার সময় কিছু পরিমাণ মাদক পানীয় জলে নিক্ষেপ করা হয়।

খ্রীষ্টিয় প্রথা

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী লেপচারা সনাতন ও বৌদ্ধপ্রথার কিছুই অনুসরণ করে না। খ্রীষ্টান লেপচাদের নিজস্ব কোনো রীতি নাই। এরা সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্টিয় প্রথা অনুসরণ করে থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

১। লেপচাদের ধর্ম

লেপচারা মোট তিনটি ধর্মীয় সমাজে বিভক্ত। মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী অর্থাৎ "জড়-চৈতন্যবাদী", অপর অংশের তিন চতুর্থাংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং অবশিষ্টাংশ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী।

সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী লেপচারা একদিকে "জড়-চৈতন্যবাদী" এবং অপরদিকে সমপরিমাণেই "পিশাচ-উপাসনা"য় বিশ্বাসী।

১৯৪৭ সালে পশ্চিম বাংলায় (ভারতে) যে লেপচারা বসবাস করতো তাদের মধ্যে এক দশমাংশের কিছু বেশী ছিলো খ্রীষ্টান এবং বাকী অংশের দুই তৃতীয়াংশ ছিলো বৌদ্ধ এবং অবশিষ্টাংশ ছিলো সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনার জন্য যে পুরুষ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় তাকে বলা হয় "বঙ্-থিঙ্" (Wang-Thing) ও স্ত্রীজাতীয় পুরোহিতকে বলে "মোন্" (Monn)। লেপচাদের প্রধান উপাস্য দেবতা হলো পর্বত। এরা পর্বতকে তাদের আদি দেবতা জ্ঞানে আরাধনা করে থাকে। ধর্মীয় আচার-পদ্ধতিতে লেপচাদের সংগে "লিম্বু" (চুং) নামে অপর একটি পার্বত্য উপজাতির যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এদের ধর্মগ্রন্থের নাম "নামথর" (Nam-Thar)।

পিশাচকুলের ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য এরা বঙ্-থিঙ্-এর আদেশে গরু, শূয়োর, ছাগল ও মোরগ প্রভৃতি বলি দিয়ে থাকে। বিপদ-আপদ থেকে স্থায়ীভাবে দূরে থাকার আশায় তারা ঘরের এক নিভৃত কোণে একটি ছোটো পাত্রে কিছু চাল ও একটা রূপার পয়সা রেখে দেয়। সনাতন প্রথায় বিশ্বাসী লেপচাদের মধ্যে প্রায় অর্ধাংশ এখনও পিশাচ উপাসনায় বিশ্বাসী।

"নামথর" গ্রন্থটি প্রধানতঃ সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী লেপচাদের পারলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহার হয়ে থাকে। এই গ্রন্থটির মধ্যে মৃতের আত্মার নানাবিধ গতির বর্ণনা বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে। জীবনে নানাবিধ কর্মের জন্য ফলস্বরূপ নানাবিধ গতির উল্লেখ আছে। তদুপরি মৃতের আত্মা কী ভাবে নরক বা স্বর্গে গমন করে তার বিস্তৃত বর্ণনাও আছে। লেপচাদের মধ্যে সনাতনপন্থীরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা বিশ্বাস করে আত্মার মৃত্যু নাই। আত্মা অজর, অমর।

লেপচা বিবাহাদিতে "নামথরের" কোনো প্রয়োজন হয় না; অন্ততঃ অনুসন্ধানের ফলে তাই জানা গেছে। "নামথর" একটি দুর্মূল্য হাতে লেখা পুঁথি। সাধারণতঃ এটি লেপচা পুরোহিত "বঙ্-থিঙে"র হেফাজতে থাকে।

আমি আমার অনুসন্ধানকালে সুবিস্তৃত সিকিম রাজ্যে, নেপালের ইলাম অঞ্চলে, ভুটানের তরাই অঞ্চলের কিয়দংশে এবং দার্জিলিঙ্ জেলার লেপচা অধ্যুষিত অঞ্চলে মাত্র ১০/১১ খানা "নামথর" গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। কোনো গ্রন্থ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সযত্নে রক্ষিত আছে আবার কোনোটি লেপচা উপাসনালয়ে বঙ্-থিঙ্-এর হেফাজতে আছে। লেপচা ভাষায় মুদ্রিত "নামথর" আছে বলে আমার জানা নাই।

ধর্ম ও দর্শনতত্ত্ব সন্ধানীদের দৃষ্টি এই পুস্তকখানির দিকে আকর্ষণ করা হচ্ছে।

জড়োপাসনায় বিশ্বাসী লেপচারা সমানভাবেই পিশাচ উপাসনায় বিশ্বাসী। একদিকে যেমন তারা "কাঞ্চনজঙ্ঘাকে" তাদের সৃষ্টিকর্তা বলে মনে করে থাকে অপরদিকে তারা সমভাবেই কয়েকটি অপদেবতাকেও বিশ্বাস করে।

তাসেথিঙ্ সহ অন্যান্য উপদেবতারা সম্মিলিতভাবে "বম্" নামে পরিচিত। আর দৈত্যকুলের শিরোমণি বা যতো কিছু অমংগলের

কর্তাপুরুষ হলেন "মুঙ্"। সাধারণতঃ গভীর জংগলে বরফঢাকা পাহাড়ের অন্ধকার উপত্যকায় ও পুরোনো স্যাংসেঁতে গুহায় "মুঙ্" বাস করেন। "মুঙ্" সাধারণতঃ একলাই থাকেন। তাঁর সংগী-সাথী কেউ একটা নাই। লেপচা পৌরাণিক উপকথায় "মুঙ্" একটা সর্বনাশা অস্তিত্ব।

"মিহ্যুপ্ মুঙ্" (Midyup Moong) নামেও তিনি পরিচিত। মিহ্যুপ্ মুঙ্-এর ঘাড়ের উপর ছুটো উজ্জ্বল চোখ আছে। তিনি নাকি ইচ্ছামতো লম্বা কিংবা বেঁটে হতে পারেন। এক এক সময় প্রয়োজন হলে তিনি দৈত্যের আকার ধারণ করে মেঘের সংগে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারেন।

মৃত্যুদূত হিসাবে লেপচারা যাকে মান্যতা দেয় তিনি হলেন "মাসো মুঙ্" (Maso-Moong)।

মাসো মুঙ্ নাকি বাড়ির চারিদিকে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকেন। রাত্রিতে এঁর রূপ অগ্নিস্রাবী কুকুরের মতো, অর্থাৎ যে কুকুরের মুখ থেকে অবিরত আগুনের হল্কা বের হয়। তিনি নাকি সর্বদাই ক্ষুধার্ত। লেপচারা লাল রং-এর পাথর আগুনে পুড়িয়ে একে উৎসর্গ করে।

লেপচাদের বিশ্বাস এই আগুনে পোড়া পাথর আহার করলে কুকুরটির জিহ্বা পুড়ে যাবে এবং ঘন ঘন আসা থেকে নিরত হবে।

"সানদোঙ্-মুঙ্" (Sandong-Moong) হলেন আর একজন ভয়ঙ্কর অপদেবতা। নির্জন পথের পথিককে পথ ভুলিয়ে তিনি নিয়ে যান বহুদূরে এবং হত্যা করেন। এই অপদেবতার সংগে নেপালী-সমাজে বহু আলোচিত "চুঁড়েল" (Chunrel) নামে অপদেবতার সাদৃশ্য আছে।

"সুমু-মুঙ্" (Soomu-Mung) নামে যে অনিষ্টকারী স্ত্রী-জাতীয় দৈত্যের কথা লেপচারা বিশ্বাস করে তার রূপ আরও ভয়ঙ্কর। অত্যন্ত কদাকার তার চেহারা, গোড়ালি ছোঁয়া একমাথা অবিন্যস্ত

চুল। সুমু-মুঙ্ নারী রাত্রির অন্ধকারে পথ-চলা পথিককে আক্রমণ করে ও হত্যা করে। প্রথমে সে অত্যন্ত সুন্দরী তরুণীর রূপ ধরে পুরুষ পথিককে এবং সুন্দর যুবকের রূপ ধারণ করে স্ত্রীজাতীয় পথিককে মুগ্ধ করে ও প্রলুব্ধ করে। ধীরে ধীরে তার সংগে ভাব জমায় এবং প্রেম নিবেদন করে। যখন পথিক সম্পূর্ণভাবে তাকে বিশ্বাস করে তখন সে ধীরে ধীরে তার আসল রূপ ধারণ করে এবং পথিককে কোনো নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে রক্ত শোষণ করে। কিন্তু লেপচাদের মধ্যে যে দেবতার কথা সর্বাধিক প্রচলিত তাকে বলা হয় "চু-মুঙ্" (Chu-moong)। এর অর্থ "তুষারমানব"। এর আকার অনেকটা বনমানুষ জাতীয়। শের্পা ও তিব্বতীয়দের মধ্যে যে "তুষারমানব" বা "ইয়েতির" (Yeati) কথা প্রচলিত আছে "চু-মুঙ্"-কেও লেপচারা ঠিক একইভাবে বিশ্বাস করে। লেপচারা "চু-মুঙ্"-কে শিকারের দেবতা এবং বন্য পশুদের পালক ইত্যাদি বলে স্বীকার করে। লেপচারা শিকারে যাবার আগে ও পরে "চু-মুঙ্"-কে পূজা দেয়।

অনেক লেপচা শিকারী শিকারকালে ঘন তুষারাবৃত অঞ্চলে তুষার-আত্মা বা "ইয়েতির" সন্ধান পেয়েছে বলে দাবী করে। বিশেষতঃ বিপদসংকুল দুর্গম ও ঘন বরফাবৃত অন্ধকার গুহাতেই নাকি "চু-মুঙ্" বাস করে।

লেপচা জাতির এই সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার বিষয়বস্তু সংগ্রহ-কালে সিকিম, নেপাল ও ভুটানের দুর্ভেদ্য পাহাড়ে এমন কয়েকজন বয়স্ক লেপচার সংগে পরিচয় হয়েছে যারা একাধিকবার "চু-মুঙ্"-এর দেখা পেয়েছেন বলে দাবী করেন।

বঙ্-থিঙ্, মোন্, পায়ো ও ন্যেন্‌জোমো

লেপচাদের মধ্যে যাঁরা পুরোহিতের কাজকর্ম করেন তাঁরা পুরুষদের ক্ষেত্রে বঙ্-থিঙ্ ও পায়ো এবং স্ত্রীদের ক্ষেত্রে মোন্ ও ন্যেন্‌জোমো নামে পরিচিত।

বঙ্-থিঙ্কে জাগতিক এবং আধিভৌতিক শক্তির যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের সংগে বঙ্-থিঙের চেহারা ও ব্যবহারের বিশেষ কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না। এরা মণিমুক্তাখচিত জপমালা ধারণ করে। সাদা পাথর আর প্রবালের মালা গলায় পরে। এরা গৃহস্থ-জীবন যাপন করে এবং অবসর সময়ে সাধারণ লেপচাদের মতোই জমির কাজকর্ম ও শিকার করে। কিন্তু বীজ বোনার সময় ও ফসল কাটার সময় অথবা সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ হলে দেবতাকুলকে তুষ্ট করার জন্য বঙ্-থিঙ্কে আহ্বান করা হয়। এরা তখন স্বজাতির সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার জন্য অসীম ক্ষমতা ধারণ করে। পূর্বপুরুষদের অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তির জন্য জোয়ারের সংমিশ্রণে প্রস্তুত একপ্রকার মাদক পানীয় এরা উৎসর্গ করে। অতৃপ্ত আত্মার ও পিশাচকুলের ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য এরা গরু, শূয়োর, ছাগল ও মোরগ প্রভৃতি বধ করে। শূয়োর ও ষাঁড়কে এরা বাঁশের তৈরী সুতীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে বিদ্ধ করে হত্যা করে এবং সেই রক্ত পূজায় ব্যবহার করে। এদের সমাজে কোনোকালে নরবলিপ্রথা ছিলো বলে জানা যায় না।

মণিমুক্তায় গাঁথা জপমালা, রংগীন পাথর আর ভাংগা ডিমের সাহায্যে বঙ্-থিঙ্ অনায়াসে মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ণনা করার ক্ষমতা রাখে। লেপচাদের বিশ্বাস—যখন রাত্রির অন্ধকারে অতৃপ্ত আত্মারা এবং পিশাচকুল পাহাড়ের গুহা এবং নির্জন উপত্যকায় হা-হুতাশ করে তখন বঙ্-থিঙ্ নাকি দেবতা আর এই পিশাচকুলের মধ্যে কথোপকথনে সাহায্য করে।

বঙ্-থিঙ্কে এসব কাজে সহায়তা করার জন্য যে স্ত্রীজাতীয় পুরোহিত থাকেন তাঁকে বলে "মোন্"। বঙ্-থিঙের মতো "মোন্"-ও নানা বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারিণী। এদের প্রধান দায়িত্ব হলো মৃতের আত্মাকে সঠিক পথ বাতলে অন্য জগতে পৌঁছে দেওয়া। উপাসনার সময় এরা এক অতি-বিচিত্র ধরনের পোষাক পরিধান

করে। মাথায় ধারণ করে পবিত্র পাখীর (কোহোম্-ফো) পালক নির্মিত মুকুট। কোমরের দু'পাশে ঝোলানো থাকে দুটি পশমের কাপড়ের তৈরী ঝুলি এবং যার বাঁধন কোণাকুণিভাবে বুকের দু'পাশ দিয়ে উপরে উঠে আসে। এই বাঁধন সজ্জিত থাকে সাদা রং-এর ঝিনুক দিয়ে। ঝুলির মধ্যে থাকে ঈগলের নখ, বুনো শূয়োরের দাঁত, বড়ো মাছের নীচের চোয়াল, পাখীর আর হরিণের চামড়া। মোন্ যখন কোনো মৃত আত্মার সন্ধান করে তখন তার পরিধেয় বস্ত্রের উপর যে সব জন্তু-জানোয়ারের চিহ্ন থাকে তাদের যে কোনো একটির রূপ ধারণ করতে পারে। বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে ক্রিয়াকর্ম-শেষে মোন্ নাকি তার ঝুলির থেকে ঐ সব জিনিসগুলি ওষুধ হিসাবে টুকরো টুকরো করে ভেংগে বা ছিঁড়ে নিয়ে বিলি করে। লেপচাদের মধ্যে সবাই যে বঙ্-থিঙ্ বা মোন্ হবার ক্ষমতা রাখে তা' নয়। লেপচাদের উপাস্য দেবতাদের নির্দেশেই এই নির্বাচন হয়। উপযুক্ত পুরুষ বা নারী নাকি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। সেই রোগভোগকালে দেবতাকুল সেই ব্যক্তির উপর নানাধরনের পরীক্ষা করেন। যদি সেই ব্যক্তি উপযুক্ত বিবেচিত হন তবেই সে বঙ্-থিঙ্ বা মোন্ হিসাবে কার্যাদি সম্পন্ন করার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

বঙ্-থিঙ্ বা মোন্ ছাড়া আরও দুই শ্রেণীর পুরোহিতের সন্ধান পাওয়া যায়। তারা হলো "পায়ো" (Pawo) ও "ঞ্যেনজোমো" (Nyenjomo)। এরা সাধারণতঃ তিব্বতী ভাষাভাষী মৃত ব্যক্তির আত্মার সংগেই যোগসাধন করে। স্বভাবতঃই মনে হয় তিব্বত থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পরই লেপচাদের সনাতন ধর্মের সংগে সামঞ্জস্য রেখে জনজীবনে প্রভাব বিস্তারের জন্যই এই পুরোহিত-কুলের সৃষ্টি হয়। উপাসনার সময় এরা তিব্বতী পোষাক পরিধান করে। এরা চুল বাঁধে পশমী সুতো দিয়ে আর যে বাজনা (সাপুড়ের ডুগ্ডুগি জাতীয়) বাজায় সেটি মানুষের মাথার খুলি দিয়ে তৈরী করা হয়। এই "পায়ো" ও "ঞ্যেনজোমোর" আর একটি যুগ্ম

সহযোগী আছে। এদের বলা হয় "য়াবা" (Yaba) ও "য়ামা" (Yama)। তবে এই "য়াবা" ও "য়ামা"-পুরোহিতদ্বয় লিম্বু (চুং) উপজাতির উপাস্য দেবতাকুলের ক্ষমতায় আস্থাবান ও শক্তিমান।

২। পার্বত্য এলাকায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও লেপচা সমাজ

১৮২৯ সালের কথা। লর্ড বেন্টিঙ্ক দার্জিলিঙে একটি স্বাস্থ্যনিবাস খোলার প্রস্তাব করেন। জেনারেল লয়েড্ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। জেনারেল লয়েড্ আশা করেছিলেন যে এই সুযোগে পার্বত্য এলাকায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার সম্ভব হবে এবং পার্বত্য উপজাতিরা বৌদ্ধধর্মের (তিব্বতের লামা ধর্ম) চেয়ে নিশ্চয়ই খ্রীষ্টধর্মকে বেশী পছন্দ করবে। ১৮৪১ সালে দার্জিলিঙ্ জেলায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য প্রথম মিশনারী দল প্রবেশ করে। এরা একটি জার্মান মিশনারী দল ছিলো বলে জানা যায়। এদের নেতৃত্ব করেন রেভারেণ্ড ডব্লিউ. স্টার্ট (Rev. W. Start) নামে একজন জার্মান খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক। দার্জিলিঙ্ অঞ্চলের উত্তর প্রান্তে (North Point) "তাকভার" (Tukver) অঞ্চলে এরা সর্বপ্রথম একটি প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করে। এই নীতিবিদ্ জার্মান মিশনারীরা তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে শ্রমিকের কাজ সুরু করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তারা বুঝতে পারলো যে এতো কম মজুরীতে পার্বত্য অধিবাসীদের সংগে পাল্লা দিয়ে রোজগার করা অসম্ভব। এর ফলে জীবিকা হিসাবে এদের অনেকেই চা-বাগানের কাজে যোগদান করে। প্রকৃতপক্ষে লেপচাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে উৎকর্ষতা প্রকাশ পায় ১৮৭০ সালে।

Mr. William Macfarlane নামে এক খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক অতি অল্পকালের মধ্যে লেপচাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে পেরেছিলেন। ১৮৮৭ সালের মধ্যে প্রায় ছয়শ' ঘর

পার্বত্য উপজাতি (এর মধ্যে অধিকাংশই লেপচা) খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। মূলতঃ দার্জিলিঙ্ জেলার কালিম্পঙ্ মহকুমাতেই এই প্রচার বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করে। এই সময়েই লেপচা ভাষায় "বাইবেল" অনুবাদ করা হয় বলে জানা যায়। এই সময়ে দার্জিলিঙ্ কালিম্পঙ্ এবং নেপালের অন্তর্গত ইলাম অঞ্চলে লেপচাদের ঘনবসতি ছিলো। এই ধর্মপ্রচারকেরা প্রচারকার্য সুরু করেন মোট চারটি ভাষায়। তাদের মধ্যে লেপচা ভাষা অন্যতম। দার্জিলিঙ্ অঞ্চল ছাড়াও ঘুম ও সোনাদা অঞ্চলেও খ্রীষ্টধর্ম প্রচার বিশেষ সাফল্যলাভ করে। জানা যায় এই সময়ে (১৮৮৭ সাল) একটি প্রোটেস্টাণ্ট মিশন আমেরিকা থেকে সর্বপ্রথমে তিব্বতে যায়। কিন্তু সেখানে লামাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী থাকায় তারা স্থায়ীভাবে সেখানে কোনো কেন্দ্র স্থাপনে সক্ষম হয় না। ১৮৯২ সালে এই দলটি দার্জিলিঙ্ এলাকায় প্রবেশ করে।

১৯০১ সালের জনগণনার রিপোর্টে দেখা যায় দার্জিলিঙ্ জেলায় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিলো প্রায় তিন হাজার। এদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী ছিলো লেপচা এবং অবশিষ্টাংশ "খাম্বা" (Khambas) নামক অপর একটি উপজাতি এবং নেপালী ভাষাভাষী তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত "কামি" (Kamis)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। লোকগীতি ও লোকগাথা

বর্তমানে লেপচা সমাজে প্রচলিত যে কয়টি লোকগীতির সন্ধান পাওয়া গেছে তার বিবরণ দেওয়া হলো। স্থান বিশেষে নামের প্রকার-ভেদ থাকলেও মোট পাঁচ প্রকার গাথা এদের মধ্যে প্রচলিত আছে। নাম যথাক্রমে (১) পৌরাণিক উপাখ্যান (মুতেন্ চি), (২) কৃষিবিষয়ক (দাম-ব্রাজো), (৩) ঐতিহাসিক উপাখ্যান (প্যাসু-লোহ্ মা-লোহ্ মা), (৪) প্রাকৃতিক বর্ণনা (থালা-থাপ্-সুকি-থাপ্), (৫) যুদ্ধের উপাখ্যান (ফেনল্যোক্)।

ব্যাখ্যা ঃ

(১) মুতেন্ চি (Mutenchi) কথাটির আক্ষরিক অর্থ হিমালয় সন্তান। এই জাতীয় লোকগীতির মধ্য দিয়ে লেপচা জাতির উৎপত্তি, সমাজের সৃষ্টি, ক্রমবিবর্তন, জীবনযাপন প্রণালী, জীবনের আদর্শ ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়।

(২) দাম্-ব্রাজো (Dum-brazo) কথাটির আক্ষরিক অর্থ একপ্রকার রবিশস্য। এই শস্যটি অন্যান্য প্রধান রবিশস্যের মতোই ঋতুকালীন শস্য। যে ঋতুতে এই শস্য কাটা হয় লেপচারা সেই ঋতুর একটি চন্দ্রালোকিত রাত্রে স্ত্রী ও পুরুষ মিলিতভাবে উন্মুক্ত প্রান্তরে দাম্-ব্রাজোর বন্দনা গান করে। অনুসন্ধানে জানা গেছে সিকিম রাজ্যে লেপচাদের মধ্যে এই শস্যটি জোয়ার (Millet) নামে পরিচিত। আবার নেপালের ইলাম ও দার্জিলিঙ্ জেলার গ্রামাঞ্চলে এটি কোথাও জোয়ার, কোথাও যব শস্য হিসাবে পরিচিত।

(৩) প্যাসু-লোহ্ মা-লোহ্ মা (Pyasu-Lohma-Lohma) কথাটির অর্থ "যুদ্ধে শক্তিদানকারী"। লেপচা রমণীরা যুদ্ধে পুরুষদের

সহগামী বা সহযাত্রী হয়ে থাকে এবং এই লোকগীতির মাধ্যমে তারা যুদ্ধে পুরুষদের নানাভাবে উত্তেজিত করে।

(৪) থালা-থাপ্-সুকি-থাপ্ (Thala-Thap-Suki-Thap) কথাটির অর্থ প্রাকৃতিক বর্ণনা। এই গীতিকার মাধ্যমে তারা দৃশ্যাবলী ব্যাখ্যা করে থাকে।

(৫) ফেন-ল্যোক্ (Fen-Lyoke) কথাটির অর্থ যুদ্ধের উপাখ্যান। বিগত দিনের যুদ্ধের বর্ণনাই এই জাতীয় গীতিকাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বলা বাহুল্য লেপচা সমাজে লোকনৃত্যের পৃথক কোনো অস্তিত্ব নাই। এই পাঁচ জাতীয় লোকগীতির ব্যবহার কালে লোকনৃত্যও পরিবেশন করা হয়। সমবেতভাবে এই লোকগীতি পরিবেশন করা হয়। এই লোকগীতির পরিবেশনকালে নৃত্যও সংযোজিত হয়।

লেপচা সমাজে বর্তমানে মোট চার প্রকারের লোকগাথা প্রচলিত আছে।

(১) ফেম্রী-সা (Femree-Sha)

(২) গো-উঙ্-সা (Go-Woong-Sha)

(৩) থেন্-উঙ্-সা (Then-Woong-Sha)

(৪) য়ু্য-মুক্-সা (Yu-Muk-Sha)

লেপচা ভাষায় "সা" (Sha) অর্থ গাথা। এই চার প্রকারের গাথার অর্থ যথাক্রমে—

(১) ফেম্রী-সা — উৎসব গাথা

(২) গো-উঙ্-সা — প্রেম গাথা

(৩) থেন্-উঙ্-সা — ব্যঙ্গ গাথা

(৪) য়ু্য-মুক্-সা —বিলাপ গাথা

প্রেম গাথা পর্যায়ে "রংগীত-রঙ্নু" বা "রংগীত ও তিস্তার নৃত্য" বিশেষ প্রচলিত। যদিও লেপচা সমাজে পৃথক কোনো লোকনৃত্যের

প্রচলন নাই তথাপি একপ্রকার ধর্মীয় আধিভৌতিক নৃত্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। "য়াবা" বা "যাবা" নৃত্য নামে এটি প্রচলিত।

ব্যাখ্যা ঃ

(১) ফেম্‌রী-সা—যে কোনো উৎসবে পরিবেশিত হয়। এই পর্যায়ের গাথাগুলির স্থানীয় ভিত্তিতে কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ আছে। যেমন—

(ক) নবশস্য ঘরে তোলার সময়

(খ) নবজাত সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায়

(গ) নবপরিণীতা বধূসহ যুবক ঘরে ফিরে এলে

(ঘ) পূজা-পার্বণে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে

(২) গো-উঙ্‌-সা—প্রেম সংক্রান্ত গাথা। এই জাতীয় গাথা স্থানীয় ভিত্তিতে রচিত ও পরিবেশিত হয়। লেপচা সমাজে বহু প্রচলিত ও পরিবেশিত এই পর্যায়ের একটি লোকগাথা হলো "রংগীত-রঙ্‌নু"।

"রংগীত-রঙ্‌নু"র বিষয়বস্তু হলো রংগীত ও তিস্তা নদীর মিলন উপাখ্যান।

এই লোকগাথাটি লেপচা সমাজে বিবাহের আসরে পরিবেশন করা হয়। বর ও কনে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে।

(৩) থেন্‌-উঙ্‌-সা—একপ্রকার ব্যঙ্গ গাথা এবং স্থানভিত্তিক। এটি হাস্য-পরিহাসকালে পরিবেশন করা হয়। একে অপরের দৈহিক খুঁত ধরে এবং গাথার মাধ্যমে প্রকাশ করে। সহরাঞ্চলের লেপচাদের মধ্যে এটির নিদর্শন মেলে না। দুর্ভেদ্য গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষেরা এই ব্যঙ্গ গাথাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

(৪) য়্যু-মুক্‌-সা—সাধারণতঃ হারিয়ে যাওয়া কোনো বস্তুকে কেন্দ্র করে রচিত হয়। এই লোকগাথাটি কোনো গৃহে মৃত্যুর

কয়েকদিন পরে যখন মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে তখন পরিবেশিত হয়। মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বিলাপ বা শোক এই গাথার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ করা হয়।

বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু লেপচা সমাজে লোকগাথা, লোকগীতি ও লোকনৃত্যের প্রচলন ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে। বহু অনুসন্ধানের পর উপরোক্ত বিবরণ সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে।

লোকগাথা ও লোকগীতির নানা প্রকার প্রকারভেদ, শ্রেণী ইত্যাদি থাকলেও সব প্রকারের গাথার ও গীতির প্রচলন নাই ও নমুনা সংগ্রহ কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়।

লোকগাথা ও লোকগীতির কয়েকটি নমুনা ঃ

(১) এ চ্যু বী (রম্যাত স হুম্)

[দেবতার উদ্দেশ্যে বন্দনাগান]

(এককভাবে) এ চ্যু বী পুম্ রম্ পম্
এ কোঙ্ চেন হ জীরম্ পম্ ইঁ
জের চিলোক্ রে ফৎ ছিঙ্
কোম্ সোম্ প হ রে মাৎ ছিং ইঁ।

(এককভাবে) হা এ স্রেইৎ বুদেবু
রম্ ছা পুম্ দোক্
রে মোং ত্যাং সাং পিকসঙ্ দিন্
হা এ স্রেইৎ বুদেবু রম্ ইঁ···য়্যু

(সম্মিলিতভাবে) সহোর লং দ্ জিৎ বু
চ্যু বী পুম্ ইৎ বু (কযোঙ্ কতি কবোম্)
আকিং- চ্যুং-জু-ব্যু-চ্যু
কয়ুম্ গুং লুং ঙ্যান্ জু (কযোঙ্ কতি কবোম্)
পঙেম্ ডুংকা জু ঙ্যান্।
কবোম্ কতি স্যু ঙ্যান্
(আকেৎ আকিয়ম্ ভ্যোং কা)

চ্যুবি পুম্ রম্ পোম্
সগোর সংগন—হ পং পোং সোং প
(সা হ্বো মাং দিং)

এই গাথাটি লেপচাদের স্বষ্টিকর্তা "রম্"এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। প্রথম লেপচা পুরুষ ফোদোং থিঙ্ বা ফোদোং ফো এবং প্রথম নারী নাজোং ন্যু-কে এই গাথাতে সম্মানের সংগে স্মরণ করা হয়েছে।

গাথাটির তৃতীয় স্তবকের তৃতীয় চরণে "কিঙ্-চ্যুং-জুং-বু"কে স্মরণ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য "কিঙ্-চ্যুং-জুং-বু" অর্থাৎ কাঞ্চনজঙ্ঘাকে লেপচারা তাদের আদি দেবতা হিসাবে ভক্তি করে। বলা বাহুল্য লেপচারা কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফের স্তূপের দ্বারাই জন্মলাভ করেছে এই তাদের বিশ্বাস। সেই অর্থে কাঞ্চনজঙ্ঘা তাদের আদি পিতা।

গাথাটির আক্ষরিক অনুবাদ লেপচা ভাষাতেও সম্ভব নয় কেননা এই গাথাটির মধ্যে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য হেতু অহেতুক বহু শব্দ ইতস্ততঃ ব্যবহার করা হয়েছে। তবু লেপচা ভাষাবিদ্ পণ্ডিতের সাহায্যে যেটুকু পাঠোদ্ধার বা মর্মোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা' নীচে দেওয়া হলো।

"রমের সৃষ্টি আমরা।
কিং-চ্যুং-জুং-বু আমাদের পিতা।
ফোদোং ফো ও নাজোং ন্যু-র
কাছে আমরা ঋণী।
আমরা এঁদের সবাই-এর বন্দনা করি।"

(১) কিং-চুং-জ্যুং-বু (কাঞ্চনজঙ্ঘা)
(২) ফোদোং ফো (আদি মানব)
(৩) নাজোং ন্যু (আদি মানবী)

(২) নংগান গ্যোত্ (বিলাপ গাথা)

সিকিমারিয়ো অনমা-গ্নারে,

সুদো কা ইয়ং মো সুংনো
বাম্ লেন্ চো···
নংগান ন্যোম্ সা
নংগান স্যোত ল্যাং তক্
চামবোং কা ;
সিকিমারিয়ো অনমা-য়ারে।
লেদোং শ্যাম্ মা
লেদোং স্যোত্ ল্যাঙ্
কুনত্থং বোংকা ;
সিকিমারিয়ো অনমা-য়ারে।
কুংকা ইয়োসিন্ কুংলা হালনুন
ফংকা মো-সিন্ ফংলা রুদনুন
সিকিমারিয়ো অনমা-য়ারে।
রেশম (তর) ফিরি-রি-রি-রি
নম্ কাঞ্চা ন বুথুং বো।
বাম্ লেং চো···
চাক্কু বংকপ্ পাঞ্চি তিয়ং সু্
নোম্ কাঞ্চি নো বোথুং বো।
বাম্ লেং চো·········
সিকিমারিয়ো অনমা-য়ারে।

এই গাথাটি বিরহে কাতরা একটি স্ত্রীলোকের কাতরোক্তি। "নংগান" নাম্নী একটি চিরকালীন স্ত্রীলোকের প্রেমিক বা স্থানান্তরে স্বামী "লোদাং"-এর মৃত্যু হয়েছে। নংগানের বক্তব্য এই যে— "এই অবলা নারীকে অবহেলা করে, প্রেম প্রীতির সম্পর্ক বিস্মৃত হয়ে লেদোং কোন বনান্তরে হারিয়ে গেলো। সমস্ত বন প্রান্তরে খুঁজে খুঁজে অবশেষে কলার বাগানে এসেও লেদোং-এর দেখা মিললো না। হায়—তার স্মৃতিস্বরূপ ছুরি, বংকপ্ (লেপচা অস্ত্র) ও নখকাটার ছোটো অস্ত্রটি পড়ে আছে। হায়—আমার কতো দুঃখ, কতো ব্যথা। লেদোং-এর বিরহে আমি বড়ো কাতরা।"

(৩) রোং হম্ গম্ (দাম-ভ্রাজো)

[কৃষিবিষয়ক গাথা]

দাম-ভ্রাজো
তুঙ্ স্যান (পোম্ কালে)
বর বর লোক সুঙ (ঘোম্ কালে)
মঙ্ রিম্ মং ওয়া
(স্যাপ নুন্ বান্)
সোসা লাবো
(লাত্ নোন্ বান্)
মঙ্ ব্রী মং ইং (মেনন্ দে)
কচের ককৌ (রেনন্ দে)
তুং বোং চি লোক্ (বোবুরে)
অা ……লোকরে সা (গু বুরে)
ফত ল্যাঙ্ সারে
(বম্ রিজোঙ্)
সূ সূ ঘাবো (ওম্ রিজোঙ্)
কঙ্কুক্ কলিত (পাত কা য়ো)
ম ও ম ই (মা কা য়ো)

এটি একটি কৃষিবিষয়ক গাথা। এই গাথাটির ভাবার্থ হলো এসো আমরা এবার নৃত্য করি। গরম কাল এসে গেছে। ভুট্টার দানা জমিতে ছড়িয়ে দেবার সময় হলো। ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে। খড় কুটো এক সংগে জড়ো করি এসো।

আমরা এবার নৃত্য করি এসো। গাছে গাছে ফুল ফুটেছে। এরপর শীতকাল আসবে। শেষরাতে আকাশ থেকে হিম ঝরে পড়বে। তার আগেই জোয়ারের পাকা দানাগুলো ঝরে পড়বে মাটিতে। গম, যব এবার জমিতে ছড়িয়ে দেবার সময় এলো। ভ্রমর খেলছে ফুলে ফুলে। আমরা এবার নৃত্য করি এসো।

(৪) কাকু সাজো মাল্ খোক্ বম্

[কৃষিবিষয়ক গাথা]

কা কু কু, কা কু কু……
নাম তচত্ কা কু কু
হুন্দেং মো (কা কু কু)
জেঙ্ ম্বাবো নাম তচং হুন্দেং মো
কা কু কু……
নাম ম নঙ্ ন বা
হক্—কা হোঙ্ সেন ল
পশ্বের সল দর্ বুরলেন লেখ
মহ য়ো (কা কু কু)
তক্ পুফু তক্ বেরফু
নাম তচং ফু গোম্ন।
দনকাহা হোঙ্ সেন ল
কা কু কু
চ্যাক্ হুন্ হুন্
চ্যাক্ হুন্ ফু গো নাম তচং
হক্ কা ম্ম্যা।
চ্যাক্ হুন্ হুন্।
দংকা থি বা……
পস্যাং পশিং পং
যো হো হো লুঙ্
চ্যাক্ হুন্ হুন্।
পঞ্জক্ সগ্রী দিপ্ কা
বামং ডানং স……
ফর ফর পাংকু দয়ুল লুং
চ্যাক্ হুন্ হুন্।
গো নে গোরোঙ্গা……
ছো নে ছোরোঙ্।

এই লোকগাথাটির আক্ষরিক অর্থ সুপরিস্ফুট নয়। তবুও গাথাটির মধ্য দিয়ে ঋতু পরিবর্তনের একটি চিত্র পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে বলা হয়েছে যে,

—"নববর্ষ এলো। ধান রোপণ করো সবাই। রোপণ করলেই ফসল পাবে। ফসল পাকলেই ফল পাবে। পাকা ফসলের ঘ্রাণে পাগল হয়ে দেশান্তরের নানা পাখী উড়ে উড়ে আসছে। নববর্ষ এলো। নববর্ষ এলো…। ইত্যাদি……"

(৫) রোঙ্ ফেন লোক সা বম্

[ফেন্‌ল্যোক্ বা যুদ্ধ নৃত্য পর্যায়ভুক্ত গাথা]

রোঙ্ কপ্ সা ফেন আলোক
চোঙ্ সিলি ব খ্রোক্ দিঙ্ ম
তডী-বো কপ্ রেগো
পঞ্জীম্ রেম ত্যু…বন স…ত্ গাত্
পঞ্জীম্ সা দনূকা থি,
চোঙ্ সালি চাম্ থো দিঙ্ য়ো
পঞ্জীম্ রেম্ আলোঙ্ অম্
করও প্লোং লা অপ কা য়ো
রোঙ্ কপ্ সা ফেন-আলোক চঙ্ সলী
রোঙ্ কপ্ সা ফেন-আলোক
বান পয়ুক বু…লক্‌দীঙ্ ম
তডী বো কপ্ রেগো
পঞ্জীম্ রেম ত্যু…বন স…ত্ গাত্
পঞ্জীম্ রেম আলোম ফেত্
অথ্যাক্ প্লং লা ফেত কা য়ো
রোঙ্ কপ্ সা ফেন-আলোক
বান্ পয়োক্ বু লক দিঙ্ মো।

প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সহগামী হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে

উৎসাহ দিতো। এই গাথা সহযোগে নৃত্য করে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের উত্তেজিত করতো।

এই গাথাটির মধ্যে এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে যে—"তীর ধনুক ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে চলো। শত্রু নিধনে তোমার বুক পেতে দাও। আমি অস্ত্র সরবরাহ করছি। তোমার হাতের ধারালো বংকপ্ (লেপচা অস্ত্রবিশেষ) দিয়ে শত্রুর মাথা চিরে ফেলো। আমি তোমার হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছি।…ইত্যাদি।

লেপচা উপকথা

১। তিস্তা ও রংগীতের পরিণয়

লেপচাদের উপকথায় "তিস্তা ও রংগীতের পরিণয়" একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তিস্তা নদীকে নারী ও রংগীত নদীকে পুরুষ হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে।

লেপচা উপকথায় জানা যায় একসময় তিস্তা ও রংগীত নদী সিকিমের দুটি পৃথক পৃথক এলাকায় প্রবাহিত হতো। একটি নদী থেকে অন্যটির দূরত্ব ছিলো অনেক। এই ব্যবধান তাদের কাছে অসহ্য হওয়ায় তারা বিবাহের দ্বারা একত্রিত হবে এই বাসনা মনে পোষণ করে। বিবাহে উভয়ে সম্মত হয়ে তারা বর্তমানে যে স্থানে মিলিত হয়েছে সেই স্থানটিকে উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট করে। সেই সময়ে এই স্থানটিতে পৌঁছুবার পথ তাদের উভয়েরই অজানা ও অজ্ঞাত ছিলো। সেজন্য তারা সে অঞ্চলের পথঘাট সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এক একজন পথ-প্রদর্শক নিযুক্ত করলো। তিস্তা নদীর পথ-প্রদর্শক ছিলো একটি কালো রং-এর সাপ, যার গতি ছিলো বিদ্যুতের মতো এবং যে বিভিন্ন খাদ ও উপত্যকা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ছিলো। এই কালো রং-এর সাপটির পিছনে ছুটতে ছুটতে তিস্তা নদীর গতিপথও সর্পিল হয়ে গেলো। এদিকে রংগীতের ভাগ্য অতোটা সুপ্রসন্ন ছিলো না। রংগীতের পথ-প্রদর্শক

ছিলো একটি পাখী। পাখীটি ক্ষুধার্ত ছিলো। তাই রংগীতকে পথ দেখানোর সময় সে অনবরত পাহাড়ের খাদে, সংকীর্ণ-গিরিখাতের মধ্যে ঢুকে ঢুকে খাদ্যের সন্ধান করছিলো। আর রংগীত নদীকেও তার পিছনে পিছনে ছুটে যেতে হওয়ায় কালক্রমে রংগীতের গতিও ঘোরালো ও জটিল হয়ে যায়। রংগীতের গতি তাই সহজ নয়। নানা বাঁক, নানা খাদ ও গিরিবর্ত্মের পাশ ঘেঁষে তাকে বয়ে যেতে দেখা যায়। তিস্তা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে রংগীতকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে পড়ে। এদিকে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছুতে না পেরে রংগীত আর এগিয়ে না গিয়ে পিছন ফিরে চলে আসবে স্থির করলো। কিন্তু অবশেষে তিস্তাকে দেখতে পেয়ে আর সে ফিরে গেলো না। সেই নির্দিষ্ট নির্জন উপত্যকায় তারা উভয়ে মিলিত হলো এবং তরাই-এর জংগল পার হয়ে তারা নীচে সমতলের দিকে নেমে গেলো।

আজও যখন কোনো লেপচা যুবক-যুবতী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন বিয়ের আসরে অতিথিরা এই তিস্তা ও রংগীতের মিলন স্মৃতি স্মরণ করে নবদম্পতির ভবিষ্যৎ জীবনধারা নদীর ধারার মতো সহজ, সাবলীল ও সুন্দর হোক এই কামনা করে। এই বিবাহ উৎসবে লেপচা যুবক-যুবতীরা সুর করে গায় একটি গাথা। যার প্রথম স্তবক আবৃত্তি করে যুবকেরা আর দ্বিতীয় স্তবক আবৃত্তি করে যুবতীরা। গাথাটির সহজ ছন্দানুবাদ প্রকাশ করা হলো :

(ক) (যুবক) আমার হৃদয় জেনো খোলা,
তোমাকে আমি বলবো জেনো সব,
ধৈর্য ধরে শোনো আমার কথা।

(খ) (যুবতী) কান পেতেছি তোমারই লাগি আমি
শুনবো আমি তোমার কথা সব
তার ধ্বনি জানি কতোই যে না মধুর—
শুনবো বসে, কান পেতেছি আমি।

(ক) অনেক কথাই হয় যে বলা শুধু,
শুধু একটা কথা নিত্য মনে রেখো ;
"দোঁহায় মোরা প্রেম যেনো গো করি"
এই কথাটি নিত্য মনে রেখো।

(খ) আমি তো হায় সরলা এক বালা,
এই জগতের রীতি নেইকো জানা ;
তুমি কিন্তু চতুর পরিশ্রমী
(আমায়) সব কিছুকে শিখিয়ে দিতে হবে।

(ক) আমি এখন মুক্তকণ্ঠে বলি
তুমি যেনো তিস্তা নদীর ধারা ;
আর আমি যেনো রংগীতেরই বারি,
(আমরা) এদের মতোই যেনো মিলতে পারি।

(খ) সত্যি আমি তিস্তা নদীর মতো,
সেই সৃষ্টিকালের আদি থেকেই যেনো ;
বর্তমানের এই মুহূর্তে আমি,
(যেনো) আমি মায়ের কোলে কলঙ্কহীন রতন।

(ক) আমি এক নবীন লেপচা যুবক,
নেমে এলাম সুউচ্চ ঐ হিমবাহের থেকে ;
হায়রে আমার কী আনন্দ আজ
আমায় তুমি চিনতে পেরেছো।

(খ) লেপচা ঘরের আমি এক মেয়ে,
তোমার লাগি আছি অপেক্ষিয়া
(তুমি) আসবে নেমে হিমবাহের থেকে।

(ক) আমরা এসেছি একটি জাতির থেকে,
আমরা ভেসেছি একটি যুগলস্রোতে ;
বিধাতা মোদের করেছে আশীর্বাদ।

(খ) তুমি, যে যুবক রংগীত-নদী মতো,
আর আমি এই তিস্তা নদীর ধারা ;
আমরা উভয়ে মিলিত যে হবো
(সে তো) বিধাতার ছিলো ইচ্ছা।

(ক) এখন তো মোরা উভয়ে হয়েছি মিলিত,
বয়ে যাবো মোরা একটি একক ধারায়,—
—মণিমুক্তার খোঁজে, গভীর সাগর পানে।

(খ) যদি মোরা পাই মণিমুক্তার রাশি
ভবিষ্যতের বংশধরেরা সব
ছড়িয়ে পড়বে তামাম দুনিয়া ভরে।

২। জলপ্লাবন ও সৃষ্টিরহস্য

এক সময় পৃথিবীতে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিছুসংখ্যক লোক ত্যোন্‌দোঙ্‌ পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেয়। ত্যোন্‌দোঙ্‌ পাহাড়ের আড়াআড়ি আর একটা পাহাড় আছে তার নাম মেনোম্‌। লেপচা উপকথায় ত্যোন্‌দোঙ্‌কে ভাই আর মেনোম্‌কে বোন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

জলপ্লাবনে বহু পাহাড় পর্বত ডুবে যায়। ভাই ত্যোন্‌দোঙ্‌ জলে ডুবে গেছে মনে করে বোন মেনোম্‌ মাথা ঘুরিয়ে তা দেখলো। দেখতে গিয়ে মেনোম্‌ জলের নীচে তলিয়ে গেলো।

ত্যোন্‌দোঙ্‌ পাহাড়ে আশ্রয়লাভকারী লোকেরা মেনোম্‌ পাহাড়কে অদৃশ্য হতে দেখে মনে করে মেনোম্‌ সম্ভবত আত্মগোপন করেছে। এই "আত্মগোপন করা" শব্দটিকে লেপচা ভাষায় বলে—"মা-নোম্‌"। মা-নোম্‌ শব্দটির অপভ্রংশই "মে-নোম্‌"। সিং-এর মতো মাথা উঁচু করে আছে ত্যোন্‌দোঙ্‌ পাহাড়। সিং শব্দটিকে লেপচা ভাষায় বলে "তগ্‌রোঙ্‌"। তগ্‌রোঙ্‌ শব্দটির অপভ্রংশই ত্যোন্‌দোঙ্‌। ত্যোন্‌দোঙ্‌ পাহাড়ে আশ্রয়লাভকারী লোকেরা ক্রমবর্ধমান জলের রেখা দেখে ভয় পেল। কিন্তু তারা একান্ত নিরুপায়। হঠাৎ কোথা থেকে এলো একটি পায়রাজাতীয় পাখী। লেপচা ভাষায় সে পাখীর নাম "কারোম্‌"। সে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে "ঝাঁড়" নামক মাদক পানীয় উৎসর্গ করায়—অবশেষে জলপ্লাবনের ধারা হ্রাস পেলো এবং শরণার্থীরা রক্ষা পেলো।

কারোম্-ফো (পাখী) বা কোহোম্-ফো অর্থাৎ এই উদ্ধারকারী পাখীকে লেপচারা "জাতীয় পাখী" হিসাবে মর্যাদা দেয়। প্রকাশ এই অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য পাখীটির গলার নীচে শুঁকলে নাকি আজও "জাঁড়" নামক মাদক পানীয়ের ঘ্রাণ পাওয়া যায়।

৩। স্বর্গে যাওয়ার সিঁড়ি

এক সময় লেপচাদের একটি শাখা যারা "নায়োঙ্" (Nayong) নামে পরিচিত ছিলো, তারা আকাশ স্পর্শ করার জন্য একটা বিরাট মিনার তৈরী করতে মনস্থ করেছিলো।

এরা মাটির হাঁড়ি একের পর এক সাজিয়ে মিনার তৈরী করে আকাশে পৌঁছুবার চেষ্টা করেছিলো। মিনারের চূড়ায় বসে যারা কাজ করছিলো তারা একদিন দেখতে পেলো আকাশ একেবারে নীচে নেমে এসেছে অর্থাৎ তারা এতো উঁচুতে উঠেছিলো যে তাদের মনে হয়েছিলো এক লাফেই বোধহয় আকাশ ছোঁয়া যাবে। তখন তারা এই ভেবে নীচে যারা তাদের কাজে সাহায্য করছিলো তাদের ডেকে ইশারা করে জানালো যে তাদের একটা বাঁকানো কাঁটা বা হুক জাতীয় জিনিসের প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নীচের কর্মরত লোকেরা ভাবলো যে উপরের লোকেরা নিশ্চয়ই আকাশের পথে স্বর্গে পৌঁছে গেছে, তাই তারা মিনারটাকে ভেঙে ফেলতে ইংগিত করছে। নীচের লোকেরা মিনারের গোড়া থেকে ভাঙতে সুরু করলো। এবং এক সময় ভীষণ শব্দ করে সমস্ত মিনারটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। উপরের লোকগুলি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে মারা গেলো। নীচের অধিকাংশ লোকই মিনারের নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারালো। যারা দু'চারজন ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলো তারা একে আর একজনকে চিনতে পারলো না। তাদের স্মৃতিবিভ্রম হলো। এক সময় তারা দেশের অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো এবং এরাই নাকি হিমালয়ের অন্যান্য উপজাতিদের পূর্বপুরুষ।

৪। দিন-রাত্রির সৃষ্টি

লেপচা কিংবদন্তীতে আছে যে সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীতে দুটি সূর্যের আবির্ভাব ঘটে। একজনের উদয় হতো দিবালোকে, অন্যটির দিবা-অবসানে। অহর্নিশি সূর্যালোকে পৃথিবীর মাটি, পাথর, গাছপালা, প্রাণীকুল উত্তপ্ত হয়ে যায়। প্রখর তাপে নদী যায় শুকিয়ে, গাছের ফল ঝরে পড়ে, ফুল কুঁড়িতেই বিনাশ হয়, পাতার রং হলুদ আকার ধারণ করে। তখন জীবজগৎ ও প্রকৃতি সম্মিলিতভাবে স্থির করে যে একটি সূর্যকে ধ্বংস করতে হবে, না হলে সৃষ্টি রক্ষার আর অন্য কোনো পথ নাই।

একটি ব্যাঙ এই সিদ্ধান্তকে চরম রূপ দেবে স্থির হলো। ব্যাঙটি "কা-নাম" গাছের তীর (চ্যোং) দিয়ে সূর্যদের মধ্যে জ্যেষ্ঠটিকে বধ করলো। অপর সূর্যটি এই অপ্রীতিকর ঘটনায় মর্মাহত হলো এবং দুঃখে, ক্ষোভে ও লজ্জায় কালো রং-এর কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললো। পৃথিবীর বুকে নেমে এলো অন্তহীন অমানিশা। এই অভিশাপগ্রস্ত অন্ধকারে পৃথিবীতে জন্ম নিলো সাপ ও বাঘ। এই অন্ধকারেই সৃষ্টি হলো পিশাচকুলের, অপদেবতাদের ও জাগতিক সমস্ত দুঃখের। পৃথিবীর এই দুঃখময় অমানিশায় তাকপিং (Tak-pith) বা জোনাকি পোকারা নিজ নিজ আলো বিকিরণ করে অন্ধকারকে দূর করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলো। এই অন্ধকারে পৃথিবীর বহু প্রাণী বিনষ্ট হয় সাপ ও বাঘের অতর্কিত আক্রমণে।

জীবজগৎ ও প্রকৃতির এহেন দুঃখ দেখে পৃথিবীর আদি পিতা বিচলিত হলেন। তিনি জীবিত সূর্যটিকে আবরণ মুক্ত করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু সে আদেশ গ্রাহ্য হলো না।

অবশেষে একটি বাদুড় সূর্যের কাছে জীবজগৎ ও প্রকৃতির প্রতিনিধি হয়ে আবরণ মুক্ত করার আবেদন নিয়ে গেলো। বাদুড়ের গলার স্বর ছিলো একটু বিচিত্র ধরনের। এই অশ্রুতপূর্ব স্বরের উৎস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে সূর্য বাদুড়ের মুখের দিকে তাকালো।

দীর্ঘকাল পরে সূর্য তার মুখের আবরণ উন্মুক্ত করায় তীব্র উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং সেই প্রখর উত্তাপে বাদুড়টি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। অজ্ঞান অবস্থায় বাদুড়টি পাহাড়ের উপর থেকে বহু নীচে গড়িয়ে পড়ে এবং তার পা ও ডানা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার চোখের মণি ঝলসে যায়।

এই কারণেই বাদুড়ের পা অন্য পাখীদের তুলনায় সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ও সূর্যালোকে বাদুড়ের সন্ধান পাওয়া যায় না।

এর পর সূর্যটি দিনের বারো ঘন্টা উত্তাপ বিকিরণ করে ও বারো ঘন্টা বিশ্রাম নেয়। এইভাবেই নাকি পৃথিবীতে সূর্য ও চন্দ্রের আবির্ভাব হয়। মৃত সূর্যটি চন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

লেপচা কিংবদন্তী অনুসারে সূর্য ও চন্দ্র দুটি সহোদর ভাই।

লেপচা উৎসব ও পালপার্বণ

লেপচাদের মধ্যে বর্তমানে চারটি উৎসবের প্রচলন রয়েছে। আর এই উৎসব চারটি নির্দিষ্ট সময়ে দার্জিলিঙ্ জেলা, সিকিম ও নেপালের পূর্বাঞ্চলে এবং ভুটানের পশ্চিমাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। এই চারটি উৎসবের নাম যথাক্রমে—

(১) নাম্‌বুন্ (Nam-bun)
(২) কিম্-চুম্-ঝঙ্-বু (Kim-Chum-Jhong-Boo)
(৩) ত্যোন্‌দোঙ্ (Tyandong)
(৪) সা-ক্যু (Sa-Kyu)

১। নাম্-বুন্

নাম্-বুন্ উৎসব বা নববর্ষ উৎসব সুরু হয় ইংরাজী ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে। ৩০শে ডিসেম্বর লেপচাদের বর্ষ সুরু হয়। লেপচা ভাষায় বৎসরের নাম "ক্লক্" (Klock)। আর প্রথম মাসের নাম "নাম্-বুন্"। এই উৎসবটি লেপচাদের প্রধানতম উৎসব। এই

উৎসবটির উদ্‌যাপনকাল প্রকৃতপক্ষে এক পক্ষকাল কিন্তু বর্ত্তমানে চার থেকে সাতদিন উদ্‌যাপন করা হয়। এই সময়ে তারা পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল কামনা করে নানাপ্রকার উপহার আদান-প্রদান করে থাকে। বিদায়ী বর্ষের সম্মানে ও আগামী বর্ষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে নানা ধরনের গান-বাজনার আয়োজন করা হয়। এই উৎসব সাধারণত মুক্তাঙ্গনে হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী সমস্ত নরনারীই নাচ ও গানে অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই নাচগানের ফাঁকে ফাঁকে তীর-ধনুক প্রতিযোগিতা চলে। বিজয়ীগণকে "খাদা" (Khada—হাতে বোনা খদ্দর জাতীয় বস্ত্র) উপহার দেওয়া হয়। উৎসবে লেপচা নরনারী কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে তাদের জাতীয় পোষাক পরিধান করে।

লেপচারা উৎসব অনুষ্ঠানে মাদক পানীয় গ্রহণ করে। এই পানীয়কে কোথাও "কোদো" (Kodo), কোথাও "ছ্যাঙ্" (Chhang বা Tshang) ও কোথাও "তোংবা" (Tongba) বলে।

২। কিম্-চুম্-ঋঙ্-বু

লেপচা ভাষায় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে "কিম্-চুম্-ঋঙ্-বু" বা "কিঙ্-চুঙ্-ঋঙ্-বু" বলে। এই উৎসবটির অনুষ্ঠানকাল ইংরাজী মার্চ থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত। কাঞ্চনজঙ্ঘা শব্দটির লেপচা ভাষায় অর্থ হলো "সৌভাগ্যবান উজ্জ্বল কপাল"। কেননা এদের বক্তব্য হলো সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘার কপালে বা শীর্ষে প্রথম আলোকপাত ঘটে এবং সূর্যাস্তের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই আলো থেকে সে বঞ্চিত হয় না।

লেপচারা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে পূর্বপুরুষজ্ঞানে শ্রদ্ধা করে থাকে এবং অর্ঘ্য দেয়। এর কারণ লেপচা পৌরাণিক গল্পে ও গাথায় জানা

যায় যে কাঞ্চনজঙ্ঘার দুটি শৃঙ্গ থেকেই নাকি পৃথিবীতে প্রথম দুটি মানব-মানবীর সৃষ্টি হয়েছিলো।

তৃতীয় চান্দ্রমাসে (মার্চ-এপ্রিল) লেপচারা কাঞ্চনজঙ্ঘার পূজো করে। লেপচারা তাদের গৃহের প্রাঙ্গণে কাঞ্চনজঙ্ঘার মুখোমুখি করে নয়টি পাথরের সাহায্যে একটি স্মৃতি-মন্দির প্রস্তুত করে। এই স্তূপ বা মন্দিরটিকে তারা কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রতিভূ হিসাবে স্থাপন করে। এই স্তূপ বা মন্দিরের অভ্যন্তরে তারা এক ঐশী-শক্তির উপস্থিতি কল্পনা করে।

এই স্তূপ বা মন্দিরটির উদ্দেশ্যে তারা নানা প্রকার ফলমূল ও মূল্যবান রত্নসম্ভার উৎসর্গ করে। তাদের বিশ্বাস এই উৎসর্গ করার ফলে তারা সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

৩। ত্যোন্-দোঙ্

লেপচা পৌরাণিক গাথায় রয়েছে যে হাজার হাজার বছর আগে এক সময় পৃথিবী জলমগ্ন হয়েছিলো এবং সে সময় দুটি লেপচা নারী-পুরুষ দার্জিলিঙের সন্নিকটে "ত্যোন্-দোঙ্" নামক একটি পাহাড়ে আশ্রয় লাভ করে। লেপচাদের মধ্যে একটি সহজ বিশ্বাস রয়েছে যে অষ্টম চান্দ্রমাসে যদি কেউ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই পাহাড়ে আরোহণ করতে পারে তবে আগামী বৎসরে তার কোনো বিপদ বা দুর্ঘটনা ঘটবে না। এই উৎসবের দিনে আজকালও বহু লেপচা ঐ পাহাড়ে উঠে থাকে। অনেক অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে ঐ পাহাড়টি সম্ভবত "সান্দাক্-ফু" (Sandak-phu) অথবা "বাঘপাহাড়" (Tiger Hill) ছাড়া অন্য কোনো পাহাড় নয়। অষ্টম চান্দ্রমাসে অর্থাৎ অগাস্ট মাসে যখন দার্জিলিঙ্ অঞ্চলে প্রবল বর্ষণ চলে সে সময় পিচ্ছিল, কর্দমাক্ত, খাড়া ও ভয়াবহ খাদ-সংকুল এই পাহাড়ে পায়ে হেঁটে ওঠা আজ হয়তো তেমন দুষ্কর নয় তবে দশ পনেরো বৎসর আগে এটি দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিলো।

৪। সা-ক্যু

লেপচা পৌরাণিক উপাখ্যান অনুযায়ী বিশ্বাস যে কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশে "ন্যায়-ম্যায়েল-লীয়াঙ্" (Nye-Mayel-Lyang) নামে একটি পবিত্র দেবভূমি আছে। এই পবিত্র উপত্যকায় সাতটি গৃহে সাতটি পুরুষ ও সাতটি নারী আছে। তারা সকালে শিশু, দুপুরে যুবক-যুবতী এবং রাত্রে প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া হয়ে থাকে কিন্তু কখনও তাদের বয়সের বৃদ্ধি হয় না। আর তারা নাকি ঐশী ক্ষমতার বলে দিনের প্রথম কয়েকটি ঘণ্টা মাত্র পরিদৃশ্যমান থাকে।

তাদের কোনো সন্তানাদি নাই। এই দেবভূমিতে সব রকমের ফল, ফুল, শস্যাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে। লেপচাদের বিশ্বাস পৃথিবীতে ফল, ফুল, শস্যাদি প্রথমে এই দেবভূমি থেকেই এসেছে। একাদশ চান্দ্রমাসের (ইংরাজী নভেম্বর মাস) একাদশ দিনে লেপচারা ঐ ঐশী ক্ষমতায় বলবান মানব-মানবীদের উদ্দেশ্যে তাদের নবশস্য উৎসর্গ করে এবং তাদের বিশ্বাস যে ঐ উৎসর্গের মধ্য দিয়ে তাদের ক্ষেতে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

এ ছাড়াও ভুটিয়া ও লেপচা মিশ্রিত সমাজে "লোশার" বা নববর্ষ উৎসব পালিত হয়।

বৌদ্ধধর্মীয় লেপচারা বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধের আরাধনা করে থাকে। লেপচাদের মধ্যে এই উৎসবটি "চেচু" (Cheychu) নামে পরিচিত। এই উৎসবে বঙ্-থিঙ্ বা মোন্-এর কোনো ভূমিকা নাই। লামা সম্প্রদায় এই উৎসব পরিচালনা করে। এ ছাড়াও নানা প্রকার বৌদ্ধধর্মীয় উৎসব যথা—"মানে", "ইন্-চে-চুরপ্" প্রভৃতি পালিত হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মার মঙ্গলার্থে তার সমাধির উপর বা মৃত ব্যক্তির বাড়ির কোনো উন্মুক্ত স্থানে একটি বিরাট কাঠের স্তম্ভে বৌদ্ধধর্মীয় স্তোত্রাদি একটি কাপড়ে লিখে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। বৌদ্ধধর্মীয় লেপচাদের বিশ্বাস এই স্তোত্রাদি-

লিখিত কাপড়ের বাতাস সারা বিশ্বময় ভেসে বেড়াবে এবং মৃত ব্যক্তির আত্মার মংগল কামনা করবে।

সিকিম, ভুটান, নেপাল ও দার্জিলিঙ্ জেলায় গ্রামে গ্রামান্তরে এই ধরনের বহু স্তোত্রাদি-লিখিত পতাকা দেখা যায়।

লেপচারা কার্তিক মাসে "মঙ্ব্রী" (Mongbree) উৎসবও পালন করে। নতুন "কোদো" শস্যের সম্মানে এই উৎসব করা হয়।

সপ্তম অধ্যায়

লেপচা হস্তশিল্প ও চিত্রকলা

লেপচারা সৌন্দর্যপ্রিয় উপজাতি। এদের সৌন্দর্যবোধ জন্মগত। লেপচাদের মুখ্য শিল্প হলো তাঁত বস্ত্রাদি প্রস্তুত। লেপচা পুরুষ ও নারীরা হাতে চালানো তাঁতের সাহায্যে রংগীন সুতোয় এমন সুন্দর সুন্দর বিছানার চাদর, শতরঞ্চ জাতীয় বস্ত্র, ঝোলানো ব্যাগ (থলি), লেপচা পুরুষদের নিম্নাংগে পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে তা' দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

লেপচা পোষাক "দম্-পা" (Dom-pah), "দম্-দীয়ম্" (Dom-deeyam), "পাগী" (Pagee) প্রভৃতি এরা হাতে চালানো তাঁতের সাহায্যেই বুনে থাকে। এগুলির শিল্পরীতিও উচ্চস্তরের।

দার্জিলিঙ্ সদর মহকুমায় আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের নারীদের জন্য একটি "শিল্প-কলা-শিক্ষণ ও প্রস্তুত কেন্দ্র" খোলা হয়েছে। কালিম্পঙ্ মহকুমায় "আর্টস্ এ্যাণ্ড্ ক্র্যাফ্‌টস্" নামে একটি সমবায় সংস্থা আছে যেখানে বহুসংখ্যক লেপচা নারী ও পুরুষ তাঁতশিল্প চর্চা করে। এ ছাড়া উলের সাহায্যে পশমী বস্ত্র প্রস্তুতের পদ্ধতিও শিক্ষা দেওয়া হয়।

এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক আবার কাঠ ও ধাতুশিল্পেও পারদর্শী।

লেপচা নারী সোনা ও রূপার অলঙ্কার পছন্দ করে। যদিও পাথরের মালা একটি সার্বজনীন অলঙ্কার তবুও সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুর অলঙ্কারও এরা ব্যবহার করে। সুন্দর সুন্দর নক্সা করা গহনা এরা তৈরী করতে পারে। এইসব নক্সা করা অলঙ্কার অবশ্য বিশেষ বিশেষ পালপার্বণে ব্যবহার করা হয়।

প্রবাল ও অন্যান্য মূল্যবান পাথরের সাহায্যে প্রস্তুত মালা এখনও অভিজাত লেপচা পরিবারে চোখে পড়ে।

বৌদ্ধধর্মীয় লেপচারা প্রাচীর চিত্র অঙ্কনেও বিশেষ পারদর্শী। প্রায় প্রতিটি লেপচা অধ্যুষিত বৌদ্ধধর্মীয় মন্দির বা গোম্ফায় (Gompha) এই চিত্রের নিদর্শন চোখে পড়বে। তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, এইসব প্রাচীর চিত্রগুলি অধিকাংশই প্রকৃতি-বিষয়ক। অবশ্য বুদ্ধদেব ও তাঁর শিষ্যবর্গের অবয়ব সম্বলিত প্রাচীর চিত্রও এঁরা সমান দক্ষতার সংগেই অঙ্কন করে থাকে।

ঘুম গোম্ফা (দার্জিলিঙ্ সদর মহকুমা), তুঙ্-সুঙ্ (Tung-Sang বা Tuen-Shang) গোম্ফা (দার্জিলিঙ্ সহর সংলগ্ন) এবং গ্যাংটক রাজকীয় গোম্ফার (সিকিম নৃপতির রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন) প্রাচীর চিত্রগুলি সত্যই অপূর্ব।

অষ্টম অধ্যায়

সিকিমে রাজতন্ত্রের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

লেপচাভূমির আদিবাসী এই সরল ও সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত, নিরভিমানী উপজাতিটির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থাই অত্যাবধি সুষ্ঠু রূপ ধারণ করেনি। আমাদের জাতীয় সরকার ভারতে বসবাসকারী লেপচাদের ঐতিহ্য ও অস্তিত্ব রক্ষা করতে সচেষ্ট হলেও নিজ বাসভূমে লেপচারা পরবাসী রূপেই দিন কাটায়। আনুমানিক প্রায় চারশ' বছরের উপর অন্য জাতির শাসনাধীনে থাকায় ও প্রায় দু'শ বছরে বহিরাগতদের সংগে ক্রমাগত জীবনযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এরা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। সিকিমে বসবাসকারী উপজাতিসমূহের মধ্যে একমাত্র লেপচারাই সর্বাপেক্ষা বিপর্যস্ত।

প্রতিবেশী ভারত সরকার অত্যন্ত সহানুভূতির সংগে এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সিকিমের আদিবাসী লেপচা এবং অন্যান্য জাতি ও উপজাতির স্বার্থরক্ষা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্পে ভারত সরকার অটল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

সিকিমে গণভোট গ্রহণের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু ক্ষমতালিপ্সু সিকিমরাজ নানা টালবাহানার মধ্য দিয়ে কাল অতিবাহিত করতে মনস্থ করেন।

পুরোনো সামন্ততন্ত্রের আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলো সিকিমের মানুষ। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক পরীক্ষা তাদের প্রেরণা দিয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এ. কথা বলাই বাহুল্য যে সিকিমের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সমস্ত ব্যবস্থাই ভারত বহন করে এসেছে। সিকিমের সর্বাঙ্গীণ স্বার্থ তত্ত্বাবধানের দায় ও দায়িত্ব ভারতেরই। সিকিমের আপামর জনসাধারণ সেই

কারণেই ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখে চলার প্রয়াসী। সামন্ততন্ত্র যে এ যুগে সম্পূর্ণ অচল সে তথ্য সিকিমরাজের অজানা থাকার কথা নয়। পৃথিবীর নানা দেশে গণ-অভ্যুত্থানের সংবাদ তিনি বিলক্ষণ রাখেন। তবুও শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সংস্কারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত রূপ নেবার পূর্বাহ্নে তিনি গররাজি হলেন। আসলে সেই ক্ষমতা-প্রিয়তার প্রশ্নই বড়ো হয়ে দেখা দিলো। গণতান্ত্রিক সংবিধানে চোগয়্যালের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা থাকলেও আসলে তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রধান ছাড়া অন্য কিছু নন।

সিকিমের গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার ব্যাপারে তিনি ভারত সরকারকে সব রকমের সাহায্যের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেও কার্যকালে তিনি অরাজী হলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অতীতে সিকিম নৃপতিরা বহুবার ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তির খেলাপ করে নিজ ক্ষমতা সম্প্রসারণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁরা গোড়াতেই বিরাট ভুল করেছেন ; কেননা সিকিম ও ভুটান এক নয়। সিকিম ও ভুটান সমপর্যায়ের নয়। এর পিছনে যে ঐতিহাসিক কার্যকারণ বর্তমান তার উল্লেখ নিরর্থক। তবুও ভুটানের নৃপতির আদর্শ ও পদচিহ্ন যদি তিনি অবলম্বন করতেন তবে সমগ্র সিকিম রাজ্য জুড়ে এক বিরাট গণ-আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠতো না। ১৯৫০ সালের ৮ই মে যে ঐতিহাসিক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা' অস্বীকার ও অবমাননার মধ্য দিয়ে সিকিম-নৃপতি নিজের ক্ষমতালিপ্সু মনোভাবের পরিচয় বিশ্বের প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের কাছে তুলে ধরলেন।

অথচ বহু জল ঘোলা করার পরে হিমালয় অঞ্চলের এক অন্যতম সামন্ততন্ত্রের ঘাঁটির পতন ঘটলো "সিকিম সরকার বিলে" চোগয়্যাল কর্তৃক স্বাক্ষরদানের মাধ্যমে। সিকিম কংগ্রেসের দলনেতা কাজী লেনডুপ দোর্জি এই গণ-আন্দোলনের পুরোধা। ভারত সরকার ও

বিশ্বের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রেমী দেশ ও মানুষ চোগয়্যালের এই স্বাক্ষর দানকে স্বাগত জানিয়েছেন। এইভাবে সুদীর্ঘকালের রাজতন্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এক নবযুগের সূচনা করে গণতন্ত্রের পথে পা ফেললো সিকিম। লেপচাদের আদিবাসভূমি, সুন্দরী হিমালয়-কন্যা সিকিম।

সিকিম কখনও স্বাধীন রাজ্য ছিলো না। যোগাযোগ, আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা,— সামগ্রিক উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সিকিমের পক্ষে স্বাধীন হওয়া কোনো কালেই সম্ভব ছিলো না। ভারতের সংগে সিকিমের আত্মিক যোগা-যোগ বহু পুরাতন ঐতিহাসিক সত্য।

সিকিম ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতো। জানা যায় ১৮৮০ সালে মিস্টার ক্লড্ হোয়াইট (Mr. Clod Whitte) সিকিমে প্রথম রাজনৈতিক আধিকারিক (Political officer) নিযুক্ত হন। ১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের এক আদেশবলে দেশীয় রাজ্যের তালিকায় সিকিমের নাম লক্ষ্য করা যায়।

"ভারতীয় দেশীয় নৃপতি ও দেওয়ানদের নিমিত্ত সংস্থায়" (Indian Chamber of Princes & Dewans) ১৮৮০ সালের আগে থেকেই সিকিম নৃপতির নাম অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। বলাবাহুল্য ভুটান ও নেপাল রাজ্যের নৃপতিরা কখনই এই সংস্থার সদস্য ছিলেন না।

১৯৪৭ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ৫৩৬টি দেশীয় রাজ্য ভারতে যোগদান করে। এই সময় সিকিম সরকারের সংগে ভারতের এক উল্লেখযোগ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়।

এই চুক্তির ফলে প্রাক্-স্বাধীনতা কালে ইংরেজ সরকারের সংগে সিকিমের যে সম্পর্ক ছিলো তা' ভারত সরকারের পক্ষে বর্তায়।

এরপর ১৯৫০ সালের চুক্তি অনুযায়ী সিকিম ভারতের একটি অন্যতম আশ্রিত রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়।

মূলতঃ সিকিম নৃপতি চোগয়্যালের পক্ষে সোজাসুজি এই চুক্তি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলো না। অসন্তোষের ফলে চোগয়্যাল আপন ক্ষমতা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হয়ে উঠেন।

বলাবাহুল্য সিকিমের জনসাধারণ চোগয়্যালের এই ব্যক্তিগত ক্ষমতালিপ্সুতা কোনোক্রমেই সহ্য করতে পারেনি এবং মাঝে মাঝেই সিকিমের বিভিন্ন প্রান্তে প্রবল আকারে চোগয়্যাল-বিরোধী বিক্ষোভ লক্ষ্য করা যায়। ফলে চোগয়্যালকে আত্মরক্ষার জন্য ভারতে আশ্রয় ভিক্ষা করতে হয়। এই ক্রমাগত জন-অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও চোগয়্যাল কখনও সিকিমের জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা দূর করবার জন্য উপযুক্ত ও যথাযথ প্রচেষ্টা চালাননি বরঞ্চ সিকিমের জনসাধারণের মধ্যে জাতিগত বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন।

"সিকিম সরকার বিলে"

চোগয়্যাল স্বাক্ষরদানে বাধ্য হলেও সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রশাসন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করার জন্য তিনি সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

এরপরে পূর্ণদায়িত্বশীল সরকার স্থাপনের তথাকথিত যে প্রতিশ্রুতি চোগয়্যাল দিয়েছিলেন তা' সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী কাজী লেনডুপ দোর্জী অগ্রাহ্য করে দেন।

এরপর সিকিমের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। মন্ত্রিসভার সম্মতিক্রমে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী এই মর্মে একটি আবেদন পেশ করেন যে সিকিমকে অবিলম্বে ভারতের অন্যান্য অংগরাজ্যের মতো পূর্ণ অধিকার ও দায়িত্ব দেওয়া হোক।

সিকিম বিধানসভায় ১৯৭৫ সালের ১০ এপ্রিল যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার ফলে সিকিমের চোগয়্যাল-তন্ত্রের অবসান ও সিকিমের পুরোপুরি ভারত-অন্তর্ভুক্তির সমর্থনে ১৯৭৫ সালের ১৪ এপ্রিল গণভোট গ্রহণের প্রস্তাব স্বীকৃতি পায়।

এরপর ভোটগ্রহণের ফলে দেখা যায় ভোটদানকারীদের প্রায় শতকরা ৯৭ ভাগ সিকিম বিধানসভার প্রস্তাব সমর্থন করে।

ভারত সরকার সিকিমকে ভারতের অংগরাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি-দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সিকিমের আয়তন ২,৭৪৫ বর্গমাইল বলে জানা যায় ও জনসংখ্যা ২ লক্ষের কাছাকাছি। সিকিমে লেপচা ছাড়া ভুটিয়া, নেপালী, বিহারী, মারোয়াড়ী এবং কিছু সংখ্যায় বাঙালী ও অন্যান্য ভারতীয় জাতি দেখা যায়। সিকিমে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মোঙ্গল এবং ভারতীয় সংমিশ্রণজাত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের শান্তিপূর্ণভাবে পাশা-পাশি বসবাস করতে দেখা যায়।

সিকিমের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবেই কৃষি ও পশুপালন নির্ভরশীল। প্রধান শস্যাদির মধ্যে ধান, যব, গম, বার্লি ও ভুট্টা দেখা যায়। এ ছাড়া প্রধান অর্থকরী ফসল হলো, এলাচ। কমলালেবু, কলা, আপেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সিকিমে একটি ফল ও ফলজাত পানীয়ের প্রস্তুত কেন্দ্র আছে।

আমাদের জনপ্রিয় জাতীয় সরকার সিকিমের আদিবাসী লেপচাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে অবিলম্বে যে উপযুক্ত ও কল্যাণকর পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এতে কোনো সন্দেহ নাই।

নিজ বাসভূমে আবার লেপচারা উন্নত হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে এ আশা করা অযৌক্তিক হবে না।

জাতীয় সংহতির স্বার্থে একে অপরকে জানার এবং অনুন্নত, অবহেলিত সমাজকে উন্নতির সোপানে তুলে ধরার প্রয়াস জয়যুক্ত হোক।